POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া। (আল মায়েদা: ৯৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 24

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 16 ই জুন, 2022 15 জুল কাআদা 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম।

সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া সদকা হিসেবে দেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বিক্রি হতে দেখে নিজেই কিনে নিতে চান। তিনি (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিজের সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নিও না।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জুমআর খুতবা, ৬ মে, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

সিদ্দীক-এর মর্যাদায় কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান, এর প্রতি ভালবাসা এবং এর মাঝে নিহিত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। শহীদ সেই মর্যাদার নাম যেখানে মানুষ প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ তা'লাকে প্রত্যক্ষ করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

দ্বিতীয় ধাপটি হল সত্যবাদীর অর্থাৎ সিদ্দীক-এর। সত্যতার পরিপূর্ণ গুণাবলী ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত তওবার সাথে সত্যতার মর্যাদায় পৌঁছয়। কুরআন করীম সকল সত্যের সমষ্টি এবং পরিপূর্ণ সত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ নিজে সত্যবাদী হয়, সে সত্যের পরাকাষ্ঠা এবং মর্যাদা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হতে পারে?

সিদ্দীক-এর মর্যাদায় কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান, এর প্রতি ভালবাসা এবং এর মাঝে নিহিত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। কেননা মিথ্যা আকর্ষণ করে মিথ্যাকেই। এই কারণেই মিথ্যাবাদী কখনও কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। এই কারণেই বলা হয়েছে- لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (আলওয়াকেয়া:৮০)

তৃতীয় মর্যাদাটি হল শহীদের। সাধারণ মানুষ শহীদের এই অর্থই বুঝেছে যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছে, নদীতে ডুবে মারা গিয়েছে কিম্বা মহামারিতে মারা গিয়েছে-ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলছি, কেবল এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করা এবং এই সীমার মধ্যেই একে বেঁধে রাখা মোমেনের মর্যাদার পরিপন্থী। বস্তুত, সেই ব্যক্তি শহীদ যে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অবিচলতা ও স্থিতিশীলতার শক্তি লাভ করে, কোনও আলোড়ন বা দুর্ঘটনা তাকে পাল্টাতে পারে না। সে বিপদ ও দুর্যোগের সময় বুক চিতিয়ে লড়াই করে, এমনকি কেবল খোদা তা'লার জন্য নিজের প্রাণও যদি দিতে হয়, তবুও এক অনির্বচনীয় অবিচলতা সে লাভ করে। আর কোনও প্রকারের দুঃখ ও আক্ষেপ অনুভব ছাড়াই নিজের মাথা পেতে দেয় আর সে চায় বার বার জীবন লাভ করুক আর বার বার তা খোদার পথে উৎসর্গিত হোক। তার আত্মা এমন এক অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে যে, প্রত্যেক তরবারি যা তার উপর পতিত হয় আর প্রত্যেক প্রহার যা তাকে পিষ্ট করে দেয়,তা তাকে এক নতুন জীবন, নতুন আনন্দ ও সতেজতা দান করে। এটিই হল শহীদের অর্থ।

তাছাড়া এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'শাহাদ'। যারা কঠিন ও অসাধ্য ইবাদত সহন করে এবং খোদার পথে প্রত্যেক কষ্ট ও তিক্ততা সহন করে এবং সহন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তারা 'শাহাদ'(মধু)-এর ন্যায় মিষ্টতা লাভ করে। যেমনটি 'শাহাদ' (মধু) فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ (নহল:৭০) এর সত্যায়ন স্থল। এরাও এক প্রকার সঞ্জীবনী সুধা হয়ে থাকে। তাদের সহচার্যলাভকারীরা বহু ব্যধি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

এছাড়াও শহীদ সেই মর্যাদার নাম যেখানে মানুষ প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ তা'লাকে প্রত্যক্ষ করে অথবা বিশ্বাস করে যে, সে খোদাকে দেখছে। এর নাম হল 'এহসান'।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৫)

দুধ তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে যা সেই সময় মানুষ জানত না, পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে।
কিন্তু কুরআন করীমের বর্ণনা বিজ্ঞানের বর্তমান গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল- এর ৬৭ আয়াত

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ
نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ
لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন-এই আয়াত এ বিষয়েরও সাক্ষী যে, যিনি কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন, তিনিই এই জগতের স্রষ্টা। কেননা এই আয়াতে দুধ তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে যা সেই সময় মানুষ জানত না, পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ায় খাদ্য যকৃত থেকে ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্তে এসে তা থেকে তরল খাদ্যে পরিণত হয় এবং তার একটি অংশ রক্তে পরিণত হয় আর অপর অংশটি দুধে পরিণত হয়। কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পরের গবেষণা থেকে এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালের তফসীরকারকগণ প্রাথমিক যুগের তফসীরকারকদের ভুল উপস্থাপন করে লিখেছেন তরল খাদ্য থেকে রক্ত এবং রক্ত থেকে দুধ তৈরী হয়। তবে যে ব্যাখ্যা তারা বর্ণনা করেছেন, সেটিও পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু কুরআন করীমের বর্ণনা বিজ্ঞানের বর্তমান গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছে যে খাদ্য যকৃত

এরপর ৭ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: সূরা নুরের একটি আয়াতের নিজেই ব্যাখ্যা করে এক ভদ্রমহিলা জানতে চেয়েছেন যে, এমনটি করার অনুমতি আছে?

হুযুর আনোয়ার ১০ই মার্চ ২০২১ তারিখের চিঠিতে বলেন: আপনি এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ভাল। আপনার বাখ্যার অধিকাংশটাই জামাতের বই পুস্তকে পাওয়া যাবে। দু-একটি কথা হয়তো অতিরিক্ত হিসেবে আপনি বর্ণনা করেছেন। যেমন জয়তুনের তেলের দহন হয় ৫৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায়, সেই কারণেই এর দ্বারা তৈরী প্রদীপ পড়ে গেলে আগুন লাগে না। এটাও হয়তো জামাতের কোনও বই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমার চোখে কোনও দিন পড়ে নি।

বাকি থাকল কুরআন করীম তফসীর করার প্রশ্নটি। তাই প্রাথমিকভাবে কুরআন করীমে বর্ণিত শিক্ষা, আঁহযরত (সা.)-এর সুন্নত এবং তাঁর হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তকের ব্যপক ও গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এরপরের কোনও ব্যক্তি কুরআন করীমের তফসীর বর্ণনা করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কুরআনের তফসীরের যে নীতি বর্ণনা করেছেন সেগুলি আপনার উপকার্থে সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি।

হুযুর (রা.) একটি সত্য স্বপ্নের ভিত্তিতে কুরআন করীমের তফসীরের তিনটি নীতি বর্ণনা করে বলেন- যখন তোমাদের মাঝে কোনও আয়াতের অর্থ নিয়ে মতান্তর দেখা দেয় তখন তোমরা কুরআন করীমের অন্য আয়াতগুলি প্রণিধান করে দেখ যে, সেগুলি কোন্ অর্থকে সমর্থন করছে। যদি আয়াত না পাওয়া যায়, তবে হাদীসে এর অর্থ সন্ধান করার চেষ্টা কর। আর যদি হাদীসেও এর অর্থ না পাওয়া যায় তবে কোনও ইলহাম প্রাপ্ত পুরুষের বাণী ও তাঁর ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কেননা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সতেজ ইলহাম ও জ্যোতি লাভ করার কারণে তার মস্তিষ্ক আলোকিত হয়ে ওঠে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২ শে নভেম্বর, ১৯৪৭)

হুযুর (রা.) তাঁর রচনা 'হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম কে কারনামে' পুস্তকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণিত তফসীর করার নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- কুরআন করীম বোঝার জন্য খোদার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরী করা, একথাটি অনুধাবন করা এবং দৃষ্টি পটে রাখা আবশ্যক যে , কুরআন করীমের প্রতিটি শব্দ সুবিন্যস্ত, এর কোনও শব্দ অনর্থক নয়। এর কোনও শব্দ অর্থহীন নয়। কুরআন করীম তার নিজের প্রত্যেক দাবির পিছনে নিজেই যুক্তি উপস্থাপন করে। কুরআন করীম নিজেই তার ব্যাখ্যা করে। কুরআন করীমের মাঝে কোনও সংঘাত নেই। কুরআন করীম নিছক কোনও কাহিনীর সমাহার নয়। কুরআন করীমের কোনও অংশ রহিত নয়। খোদা তা'লার বাণী এবং সুন্নতের মাঝে বিরোধ থাকতে পারে না। আর ভাষার শব্দগুলি সমার্থক হয় না, বরং শব্দের প্রতিটি বর্ণের ভিন্ন অর্থ রয়েছে। কুরআন করীমের সূরাগুলি মানব দেহের অঙ্গাপ্রত্যঙ্গোর ন্যায় যারা পরস্পর যুক্ত হয়ে এক সত্তার রূপ পায় এবং অপরের মোকাবেলা নিজের ঔৎকর্ষ প্রকাশ করে।

(হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম কে কারনামে, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৫৭-১৫৯)

এই মূল্যবান নীতি দৃষ্টিপটে রেখে আপনি যদি মনে করেন কুরআন করীমের তফসীর যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারবেন তবে অবশ্যই লিখুন আর আমাকেও লিখে পাঠিয়ে দিন। আর এমনিতেও কুরআন কোনও বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার নয়, বরং তা সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের উৎসমুখ। প্রত্যেক শ্রেণী ও পর্যায়ের মানুষ নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে এর থেকে উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে জ্ঞান ভাণ্ডার লাভ করেছেন সে কথা উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

নীতিগত বিষয়ের যে পঞ্চম পাঠ তিনি লাভ করেছেন সেটি হল কুরআন

পঞ্চম নীতিগত জ্ঞান তাঁকে এটি দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন একটি বহু অর্থবোধক গ্রন্থ। এর অর্থের একাধিক ধারা একইসঙ্গে প্রবহমান। পাঠক বোধ-বুদ্ধির যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, এতে তাদের বোধশক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতার নিরিখে সঠিক শিক্ষা রয়েছে। অর্থাৎ, শব্দ একই কিন্তু অর্থ বহু। যদি সামান্য বোধ-বুদ্ধির মানুষ তা পড়ে তাহলে সে এতে এমন সাধারণ ও সহজ বোধগম্য বিষয় দেখতে পাবে যা মানা ও বোঝা তার জন্য আদৌ কঠিন হবে না। আর যদি মধ্যম পর্যায়ের বোধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ তা পড়ে তবে সে স্বীয় জ্ঞান অনুসারে এতে বিষয় খুঁজে পাবে। আর জ্ঞানের উন্নত স্তরে উপনীত মানুষ এটি পড়লে সে নিজের জ্ঞান মোতাবেক তাতে জ্ঞানের খোরাক পাবে। বস্তুত, স্বল্পবুদ্ধির মানুষ এটি বোঝা সাধ্যাতীত মনে করবে বা উন্নত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ এটিকে অতি সাধারণ গ্রন্থ পাবে এবং নিজ আকর্ষণ ও জ্ঞানোন্নয়নের উপকরণ খুঁজে পাবে না, এমন নয়।

(আনোয়ারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, দাওয়াতুল আমীর, পৃ: ৫১৩)

প্রশ্ন: এক অ-আহমদী আরব মহিলা হুযুরকে লেখেন, 'আমি এখনও বয়আত করি নি, কেননা আমার আশঙ্কা হয়, হয়তো বয়আতের শর্তগুলি পূর্ণ করতে পারব না।কিন্তু আমি কি নিজের বান্ধবীদের তবলীগ করতে পারি? ভদ্রমহিলা আরও প্রশ্ন করেন যে, আকাশের ছাদ বলতে কি বোঝায়? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের যে প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন তার তাৎপর্য কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৩ই মার্চ ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন-আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পেতে হলে তার জন্য সংগ্রাম ও দোয়া আবশ্যিক শর্ত। কোনও পুণ্যকর্ম অর্জন করতে হলে কেবল সংকল্পই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে কর্মও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যখন সত্যের পথ দেখিয়েছেন তখন দোয়া এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা আপনার কর্তব্য। আপনি এমনটি করলে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে আপনার জন্য আরও বেশি সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআনের শিক্ষার আলোকে এই বিষয়টিকে বর্ণনা করে বলেন-

তাকওয়ার ধাপগুলি অত্যন্ত কঠিন, সেই ব্যক্তি সেগুলি অতিক্রম করতে পারে যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে পরিচালিত হয়। তিনি যা চান, সে তাই করে, নিজের ইচ্ছেই করে না। কৃত্রিমতা দ্বারা কেউ যদি কিছু অর্জন করতে চায় তবে কখনোই পারবে না। এর জন্য খোদাতা'লার কৃপার প্রয়োজন। আর সেটা এভাবেই সম্ভব যে একদিকে মানুষ দোয়া করবে এবং অপরদিকে চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। খোদা তা'লা দোয়া এবং চেষ্টা উভয়ের তাকিদ করেছেন। أُدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ আয়াতে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আর وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আয়াতে চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকওয়া থাকবে মানুষ কখনোই রহমান খোদার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না আর যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি হবে, কখনোই মারেফাত ও তত্ত্বদর্শিতা উন্মোচিত হবে না।"

(আল বদর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩, ৮ই জানুয়ারী, ১৯০৪)

খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অর্জিত পুরস্কারের প্রতি কৃতজ্ঞতার জ্ঞাপনের আরও একটি পদ্ধতি হল, সেই সকল পুরস্কাররাজির মধ্যে অপরকে অন্তর্ভুক্ত করা। তাই আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে আপনাকে যে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন, এখন আপনিও যেভাবে ভাল বোঝেন নিজের বান্ধবীদেরকে এই সত্য পথের দিকে তবলীগ করে আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারেন।

আকাশের ছাদের বিষয়ে কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা সূর্য, চাঁদ, গ্রহ,নক্ষত্র ইত্যাদির বিষয়েও কুরআনে ব্যপকহারে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসে এই সব গ্রহ নক্ষত্রের উল্লেখ বিভিন্ন অর্থে হয়েছে। হাদীসে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যে, রোমের বাদশাহ হিরাকিল (যিনি একজন অনেক বড় জ্যোতিষি ছিলেন) নক্ষত্রের গতিবিধি দেখে অনুমান করেছিলেন যে, হুযুর (সা.)-এর আবির্ভাভ হয়ে গেছে কিম্বা তাঁর আবির্ভাবের সময় আসন্ন। (সহী বুখারী, কিতাবু বাদউল ওহী) এছাড়া হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানকে প্রহার করার জন্য এবং পথ খুঁজে বের করার জন্য চিহ্ন হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যারা এর ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা করেছে সে ভুল করেছে এবং এমন এক বিষয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে যার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

(সহী বুখারী, কিতাবু বাদউল খালক, বাব ফিন নাজুম) অনুরূপভাবে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি নক্ষত্ররাজির দ্বারা কিছু শিখেছে সে জাদুর একটি অংশ পেয়েছে। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তিব, বাব ফিননাজুম) অতঃপর আঁ হযরত (সা.) এও বলেছেন যে, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সঙ্গে কারো জন্ম-মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই। (সহী বুখারী, কিতাবুল জুমআ) কিন্তু সূর্য ও চাঁদের গ্রহণকে আঁ হযরত (সা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের দুটি বড় নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলি যথাসময়ে সমহিমায় পূর্ণ হয়েছে এবং মহম্মদী মসীহ্র সত্যতার উপর মোহর লাগিয়ে গেছে।

(সুনান দার কুতনী, কিতাবুল ঈদাইন)

জুমআর খুতবা

আমি সেই তরবারিকে, যা আল্লাহ্‌তা'লা কাফেরদের উদ্দেশ্যে খাপ থেকে বের করেছেন,পুনরায় খাপে ঢোকাব না। [হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সাজাহ বিনতে হারিস এবং মালিক বিন নুওয়ারাহ-র বিরুদ্ধে সংঘটিত অভিযানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৩ ই মে , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১৩ হিজরত, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে যেসব নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে যেসব অভিযান সংঘটিত হয়েছে তার আলোচনা চলছিল। এ প্রসঙ্গে বুতাহ্ অঞ্চল অভিমুখে মালেক বিন নুয়ায়রার দিকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর অগ্রযাত্রার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হলো, বুতাহ্ বনু আসাদ গোত্রের অঞ্চলাধীন একটি ঝরনার নাম। মালেক বিন নুয়ায়রা বনু তামীম গোত্রের একটি শাখা বনু ইয়ারবূ গোত্রের সদস্য ছিল। সে নবম হিজরী সনে স্বজাতির লোকদের সাথে মদিনায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মালেক বিন নুয়ায়রা তার জাতির সরদারদের একজন ছিল। আরবের সনামধন্য বীর এবং দক্ষ অশ্বারোহীদের মাঝে তাকে গণনা করা হতো। মহানবী (সা.) তাকে তার গোত্রের যাকাতের সম্পদ আদায় এবং তা একত্র করার দায়িত্ব অর্পণ করে যাকাতের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন এবং আরবদের মাঝে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের ঢেউ উঠে তখন মালেক বিন নুয়ায়রাও মুরতাদদের মাঝে একজন ছিল। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ যখন তার কাছে পৌঁছে তখন সে আনন্দ ও উল্লাসের আয়োজন করে। তার ঘরের নারীরা মেহেন্দি লাগায়, ঢাক-ঢোল বাজায় এবং খুবই আনন্দ ও প্রফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ করে। এছাড়া সে নিজ গোত্রের সেসব মুসলমানদের হত্যা করে যারা যাকাত দেওয়াকে আবশ্যক জ্ঞান করার পাশাপাশি যাকাতের সম্পদ মুসলমানদের কেন্দ্র তথা মদিনায় প্রেরণেও বিশ্বাসী ছিল। অতএব, এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে বা যার বিরুদ্ধেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেছিল, মুরতাদ হওয়াই তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল না।

যাহোক এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, সে একদিকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং যাকাতের গচ্ছিত সম্পদ স্বজাতির লোকদের ফিরিয়ে দেয়, অপরদিকে নবুয়্যতের মিথ্যাদাবিকারী বিদ্রোহী মহিলা সাজাহ্-এর সাথে যোগ দেয় যে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করার জন্য এসেছিল।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৬০) (সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা আবু নাসার, পৃ: ৫৯৮) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৬৩) (মুজামুল বুলদান, ১মখণ্ড, পৃ: ৫২৭)

তার পুরো নাম ছিল সাজাহ্ বিনতে হারেস। সাজাহ্-র পরিচয় হলো, তার নাম ছিল সাজাহ্ বিনতে হারেস। ডাকনাম ছিল উম্মে সাদের। এই মহিলা আরবের এক নারী গণক ছিল আর সেই কতিপয় নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারী ও বিদ্রোহী গোত্রপ্রধানদের একজন ছিল যারা আরবে ধর্মত্যাগের সূত্রপাতের কিছু সময় পূর্বে বা ঠিক সেসময়ই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাজাহ্ বনু তামীম গোত্রের সদস্যা ছিল এবং মায়ের দিক থেকে তার বংশধারা বনু তাগলেব গোত্রের সাথে মিলিত হয়, যাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান ছিল। সাজাহ্ নিজেও খ্রিষ্টান ছিল এবং তার খ্রিষ্টান গোত্র ও পরিবারের কল্যাণে খ্রিষ্টধর্মের একজন ভালো নারী আলেম ছিল। সে তার শিষ্যদের নিয়ে ইরাক থেকে এসেছিল এবং মদিনায় আক্রমণের ইচ্ছা করেছিল। কতিপয় ঐতিহাসিকের ভাষ্য হলো, সাজাহ্ পারসিকদের ষড়যন্ত্রের অধীনে আরবে প্রবেশ করেছিল যেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পারস্য সাম্রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতাকে খানিকটা ধরে রাখা যায়। যাহোক সাজাহ্ এসব বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করে। এটি পুরোপুরি স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে, সে সর্বপ্রথম তার গোত্র বনু তামীমে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে একদল লোক এমন ছিল যারা যাকাত আদায় করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর খলীফার আনুগত্য করতে চাইছিল, কিন্তু উক্ত গোত্রের অপর পক্ষ তাদের বিরোধিতা করছিল। তৃতীয় আরেকটি পক্ষও ছিল যারা বুঝতে পারছিল না যে, কী করবে আর কী করবেনা। যাহোক, এই মতানৈক্য এতটাই চরম রূপ ধারণ করে যে, বনু তামীম গোত্র নিজেদের মাঝেই লড়াই, মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।এরই মাঝে এসব গোত্র সাজাহ্-র আগমনের সংবাদ পায় আর তারা এটিও জানতে পারে যে, সাজাহ্ মদিনায় পৌঁছে আবু বকর-এর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখে। এর ফলে মতবিরোধ আরও বিস্তার লাভ করে। সাজাহ্ এই উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হতে থাকে যে, সে তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অকস্মাৎ বনু তামিমে পৌঁছে যাবে এবং নিজের নবুয়্যতের ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাবে। পুরো গোত্র সম্মিলিতভাবে তার সাথে যোগ দিবে এবং উয়ায়না-র ন্যায় বনু তামীম-ও তার সম্পর্কে এটি বলা আরম্ভ করবে যে, বনু ইয়রবূ-র মহিলা নবী কুরায়েশদের নবীর চেয়ে উত্তম, কেননা মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর সাজাহ্ জীবিত আছে। এরপর সে বনু তামিম-কে সাথে নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হবে- এ ছিল তার পরিকল্পনা। আর আবু বকর-এর সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে জয় লাভ করে সে মদিনা দখল করে নিবে। যাহোক, সাজাহ্ এবং মালেক বিন নুয়ায়রা-র পরস্পরের সাথে যোগাযোগও হয়। সাজাহ্ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে বনু ইয়ারবূ-এর সীমান্তে পৌঁছে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে এবং গোত্রপ্রধান মালেক বিন নুয়ায়রাকে ডেকে সন্ধি করার ও মদিনায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে নিজের সাথে যাওয়ার আহ্বান জানায়। মালেক সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সে তাকে মদিনায় আক্রমণের চিন্তা থেকে সরে আসার পরামর্শ দেয় এবং বলে, মদিনায় পৌঁছে আবু বকর-এর সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে উত্তম হবে প্রথমে নিজ গোত্রের বিরোধী শক্তিকে সমূলে উৎপাটন করা। সাজাহ্‌রও এই প্রস্তাব পছন্দ হয় এবং সে বলে, তোমার যা ইচ্ছা, আমি তো কেবল বনু ইয়ারবূ-এর একজন মহিলা। তুমি যা বলবে আমি তা-ই করব। সাজাহ্ মালেক ছাড়াও বনু তামীম গোত্রের অন্য সর্দারদেরও সন্ধির আহ্বান জানায়, কিন্তু ওকী ছাড়া আর কেউ সেই আহ্বানে সাড়া দেয় নি। এতে সাজাহ্, মালেক ও ওকী এবং নিজ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে অন্যান্য সর্দারদের ওপর আক্রমণ করে বসে। তুমুল যুদ্ধ হয় যাতে উভয়পক্ষের অগণিত মানুষ মারা যায় এবং একই গোত্রের লোকেরা একে অপরকে বন্দি করে, কিন্তু কিছুকাল পরেই মালেক ও ওকী বুঝতে পারে যে, তারা সেই মহিলার কথা শুনে মহা ভুল করেছে। অতঃপর তারা অন্যান্য সর্দারদের সাথে সন্ধি করে নেয় এবং একে অপরের বন্দিদের ফিরিয়ে দেয়। এভাবে তামীম গোত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই পর্যায়ে সাজাহ্ যখন দেখেযে, এখানে কার্যসিদ্ধি কঠিন হবে, অর্থাৎ সে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, তখন সে বনু তামীম থেকে নিজের বিছানাপত্র ও তল্পিতল্পা গুটিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নিবাহ্ নামক এলাকায় পৌঁছে অওস বিন খুযায়মা-র সাথে তার মোকাবিলা হয় যাতে সাজাহ্ পরাজিত হয়। আর অওস বিন খুযায়মা তাকে এই শর্তে ফিরে যেতে দেয় যে, সে মদিনার দিকে আর পা বাড়াবে না কল্পে দৃঢ় সংকল্প করবে। এ ঘটনার পর আরব

উপদ্বীপের সেনাবাহিনীর সর্দাররা একস্থানে একত্রিত হয় এবং তারা সাজাহ্-কে বলে, এখন আপনি আমাদের কি নির্দেশ দি তে চান? মালেক এবং ওকী নিজ জাতির সাথে সন্ধি করে নিয়েছে। তারা আমাদেরকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত নয় এবং এতেও সম্মত নয় যে, আমরা তাদের এলাকা অতিক্রম করব। আর এদের সাথেও আমরা এই চুক্তি করেছি এবং মদিনায় যাওয়ার পথও আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বল, আমরা কী করব? সাজাহ্ উত্তরে বলে, মদিনা যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেলেও কোন চিন্তা নেই, তোমরা ইয়ামামা চল। ইয়ামামাবাসীরা মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। আর মুসায়লামা-র শক্তি ও সামর্থ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তার বাহিনীর নেত্রীবৃন্দ যখন সাজাহ্-র কাছে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন সে বলে,

عَلَيْكُمْ بِالْيَمَامَةِ، وَدُفُّوْا دَفِيفَ الْحَمَامَةِ، فَإِنَّهَا غَزْوَةٌ ضَرَّامَةٌ، لَا يَلْحَقُكُمْ بَعْدَهَا مَلَامَةٌ

অর্থাৎ, ইয়ামামা চল। কবুতরের ন্যায় ক্ষীপ্রতার সাথে তাদের ওপর আক্রমণ কর। সেখানে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে, যার পরে তোমাদের আর কখনো লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে না।এই ছন্দবদ্ধ বাক্যাবলী শোনার পর, যেগুলোকে তার সেনাদলের লোকেরা ওহী মনে করতো, অর্থাৎ সে নবী এবং এগুলো তার প্রতি ওহী হয়েছে, তাদের জন্য তার নির্দেশ পালন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অতএব তারা নির্দেশ পালন করে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দিক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ-শেখ আহমদ পানিপতি, পৃ: ১৯৩-১৯৮) (উর্দু দায়েরায়ে মায়ারেফুল ইসলামিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৭৩৮)

সাজাহ্ যখন নিজ সেনাদলের সাথে ইয়ামামা পৌঁছে তখন মুসায়লামা বেশ চিন্তিত হয়। সে ভাবে যে, সে যদি সাজাহ্-এর সেনাদলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তার শক্তি হ্রাস পাবে (এবং)মুসলিম বাহিনী তার ওপর আক্রমণ করে বসবে, আর আশেপাশের গোত্রগুলোও তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করবে। একথা চিন্তা করে সে সাজাহ্-র সাথে আপোষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে সে তার কাছে উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করে। এরপর এই বার্তা প্রেরণ করে যে, সে নিজে তার সাথে দেখা করতে চায়। সে মুসায়লামাকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করে। মুসায়লামা বনু হানীফা-র চল্লিশ ব্যক্তির সাথে তার কাছে আসে এবং একান্তে তার সাথে আলোচনা করে, আর এই আলোচনায় মুসায়লামা কিছু ছন্দবদ্ধ বাক্যাবলী সাজাহ্-কে শোনায়, যেগুলোতে সে খুবই প্রভাবিত হয়। সাজাহ্-ও উত্তরে তদ্রুপ কতিপয় বাক্যাবলী শোনায়।সাজাহ্কে পুরোপুরি নিজ করায়ত্বে নেওয়া ও সমমনা করার জন্য মুসায়লামা এই প্রস্তাব উপস্থাপন করে যে, চল আমরা উভয়ে নিজেদের নবুয়্যতকে একত্রিত করে নেই আর পরস্পরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই, অর্থাৎ বিয়ে করে নিই। সাজাহ্ এই পরামর্শ গ্রহণ করে আর মুসায়লামার সাথে তার তাঁবুতে চলে যায়। তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের পর সে নিজ সেনাদলের মাঝে ফিরে আসে এবং নিজ সঙ্গীদের কাছে উল্লেখ করে যে, সে মুসায়লামাকে সত্যের ওপর পেয়েছে, তাই তাকে বিয়ে করে নিয়েছে। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, কিছু মোহরানা নির্ধারণ করেছেন কি? সে বলে, মোহরানা তো নির্ধারণ করা হয় নি। তারা তাকে পরামর্শ দেয় যে, আপনি ফিরে যান এবং মোহরানা নির্ধারণ করে আসুন, কেননা আপনার মতো ব্যক্তিত্বের জন্য মোহরানা ছাড়া বিয়ে করা সমীচীন নয়। অতএব সে মুসায়লামার কাছে ফিরে যায় এবং তাকে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে। মুসায়লামা তার জন্য এশা ও ফজরের নামায হ্রাস করে দেয়। অর্থাৎ এশা ও ফজরের নামায কমিয়ে দেয় বা বন্ধ করে দেয়। যাহোক, মোহরানার বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মুসায়লামা ইয়ামামা-র জমিগুলোর খাজনার অর্ধেকউপার্জন সাজাহ্কে প্রদান করবে। সাজাহ্ এই দাবি করে যে, সে যেন আগামী বছরের অর্ধেক উপার্জন থেকে তার অংশ অগ্রিম প্রদান করে। এতে মুসায়লামা অর্ধেক বছরের উপার্জনের অংশ তাকে দিয়ে দেয়, যা নিয়ে সে জাযিরা ফিরে আসে। বাকি অর্ধেক বছরের উপার্জনের অংশ আদায়ের জন্য সে নিজের কিছু লোককে বনু হানীফাতেই রেখে আসে। সাজাহ্ পূর্বের ন্যায় বনু তাগলেব-এ অবস্থান করে। পরবর্তীতে সে তওবা করে নেয়। এ সম্পর্কে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কারো কারো মতে হযরত উমরের খিলাফতকালে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এমনকি হযরত আমীর মুআবিয়া দুর্ভিক্ষের বছর তাকে তার গোত্রের সাথে বনু তামীম-এ প্রেরণ করেন, যেখানে সে আমৃত্যু মুসলমান হিসেবে বসবাসরত ছিল।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দিক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ-শেখ আহমদ পানিপতি, পৃ: ১৯৮-১৯৯) (তারিখে তাবারী, ২য়, পৃ: ২৭১) (আল বাদাইয়াতুন নাহাইয়াতু, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৫৯)

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তুলায়হা আসাদীর বিষয়টি নিষ্পত্তি শেষে মালেক বিন নুয়ায়রার মোকাবিলার জন্য যাবেন, যে বুতাহ্-তে অবস্থানরত ছিল।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

হযরত খালেদ যখন বুতাহ্ আসেন তখন তিনি সেখানে কাউকে-ই পান নি, যদিও তিনি দেখতে পান যে, মালেক যখন নিজের বিষয়ে শঙ্কিত হয় তখন সে নিজের সকল সঙ্গীকে তাদের সম্পত্তির দেখাশোনার জন্য প্রেরণ করে আর একত্রিত হতে নিষেধ করেছে। তার এই ধারণা হয় যে, এখন মোকাবিলা কঠিন হবে, পূর্বেই হয়ত সেই মহিলার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল, এটিও কারণ হতে পারে। যাহোক, হযরত খালেদ বিভিন্ন সেনাদল এদিক-ওদিক প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এই নির্দেশ দেন যে, যেখানেই পৌঁছবে সেখানে প্রথমে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে। যে এর উত্তর দিবে না তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসো আর যে মোকাবিলা করবে তাকে হত্যা কোরো। সেসব দলের মাঝেই একটি দল মালেক বিন নুয়ায়রাকে, যার সাথে বনু ছালেবা বিন ইয়রবূ-এর কতিপয় লোক আসেম, ওবায়েদ, আরীন এবং জাফের ছিল, গ্রেফতার করে হযরত খালেদ-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। এই সেনাদলের লোকদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদাও ছিলেন, তার মতানৈক্য হয়। এখানে একটি বর্ণনা রয়েছে যা উরওয়া'র পিতা থেকে বর্ণিত যে, তখন যুদ্ধাভিযানের পর লোকজন এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, যখন আমরা আযান দিই, একামত বলি এবং নামায পড়ি, তখন তারাও এমনটিই করেছে; কিন্তু অন্যরা বলে যে, না, এমন কিছুই ঘটে নি। হযরত আবু কাতাদা (রা.) এই সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তারা আযান দিয়েছে, একামত বলেছে এবং নামায পড়েছে। এই পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যের কারণে হযরত খালেদ (রা.) তাদেরকে বন্দি করেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭২-২৭৩)

মালেক বিন নুয়ায়রা-র হত্যা সম্পর্কে দু'ধরনের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মালেক বিন নুয়ায়রা-কে হত্যা করা হয়েছিল। এক বর্ণনানুযায়ী সেই রাতে এত প্রচণ্ড শীত ছিল যে, কোন কিছুই শীত নিবারনের জন্য যথেষ্ঠ ছিল না। যখন শীতের দাপট আরও বৃদ্ধি পায় তখন হযরত খালেদ (রা.) এক আহ্বানকারীকে নির্দেশ দিলে সে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে যে, 'আদফিউ' আসারাকুম' অর্থাৎ স্বীয় বন্দিদেরকে উষ্ণতা দান কর। অর্থাৎ তাদেরকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা কর। কিন্তু বনু কিনানা-র প্রবাদ অনুযায়ী, সেখানে প্রবাদ ভিন্ন ছিল, এই শব্দের অর্থ এটি ছিল যে, (তাদেরকে) হত্যা কর। সৈন্যরা এই শব্দের অর্থ স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী এটি ধরে নেয় যে, এই বন্দিদেরকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে তারা সবাইকে হত্যা করে ফেলে। হযরত যিরার বিন আযওয়ার মালেককে হত্যা করেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আব্দ বিন আযওয়ার আসাদি মালেককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কালবীর মতে যিরার বিন আযওয়ার তাকে হত্যা করেছিলেন। খালেদ,অর্থাৎ খালেদ বিন ওয়ালীদযখন চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পান, তখন তিনি তার তাঁবু থেকে বের হয়ে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে সৈনিকরা সে সকল বন্দিদের জীবনাবসান ঘটিয়ে ফেলেছিল। এখন আর কিছুই করার ছিল না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে কাজ করতে চান তা সর্বাবস্থায় হয়েই থাকে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩,২৭৪)

অপর এক বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, হযরত খালেদ (রা.) মালেক বিন নুয়ায়রা-কে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। সাজাহ্-কে সঙ্গা দেওয়া ও যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাকে বলেন, তুমি কি জান না যে, যাকাত নামাযের সাথী; অর্থাৎ উভয়টি একই ধরনের নির্দেশ, অথচ তুমি যাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছিলে। মালেক বলে, তোমার সাথীর এটিই ধারণা ছিল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এরূপ ধারণা ছিল-এটি না বলে, রসূল বলার পরিবর্তে সাহেব বা সাথী বলে সম্বোধন করে। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তিনি কি শুধু আমাদেরই সাথী, তোমাদের সাথী নন? এরপর তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, হে যিরার! তার শিরচ্ছেদ কর। অতঃপর তার শিরচ্ছেদ করা হয়।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়াত ও কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর-আলি মহম্মদ সালাবী, প: ৩৩২)

এটি ছিল তার মৃত্যু সংক্রান্ত একটি বর্ণনা।

ঐতিহাসিক বর্ণনানুযায়ী এ বিষয়ে আবু কাতাদা খালেদের সাথে কথা বলেন এবং উভয়ের মাঝে বিতর্ক হয় আর আবু কাতাদা হযরত খালেদের সাথে মতানৈক্য করে সেনাবাহিনী ছেড়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট চলে আসেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, মালেক বিন নুয়ায়রা-কে খালেদ হত্যা করিয়েছেন, অথচ সে

মুসলমান ছিল। আর এরপর তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিয়েছেন। আর আরবের লোকেরা যুদ্ধকালীন সময়ে এরূপ বিয়েকে ভালো জ্ঞান করে না। হযরত উমর (রা.)ও কাতাদা'র এই অবস্থানের প্রতি জোরালো সমর্থন করেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

হযরত আবু বকর (রা.) আবু কাতাদা-র প্রতি এ কারণে অত্যন্ত রুষ্ট হন যে, তিনি সেনাপ্রধান হযরত খালেদের অনুমতি ব্যতিরেকে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান ক রেন যে, তিনি যেন হযরত খালেদের নিকট ফিরে যান। সুতরাং আবু কাতাদা হযরত খালেদের নিকট ফিরে যান।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩-২৭৪)

ইতিহাসগ্রন্থ তাবারীতে এর বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট নিবেদন করেন যে, খালেদ একজন মুসলমানের রক্তপাতের জন্য দায়ী; আর এ বিষয়টি যদি প্রমাণিত নাও হয়, তথাপি এতটুকু তো প্রমাণিত যার ভিত্তিতে তাকে বন্দি করা যেতে পারে। অর্থাৎ, হত্যা তো অবশ্যই হয়েছে। এ বিষয়ে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত জোর প্রদান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) যেহেতু স্বীয় কর্মচারী ও সেনা কর্মকর্তাদেরকে কখনো বন্দি করতেন না, এজন্য তিনি বলেন, হে উমর! এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন কর। খালেদ বিন ওয়ালীদের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। তুমি তার সম্পর্কেআদৌ কিছু বলো না। আর হযরত আবু বকর (রা.) মালেকের রক্তপণ দিয়ে দেন। হযরত আবু বকর খালেদ (রা.)-কে পত্র মারফত ডেকে পাঠান। তিনি আসেন এবং উক্ত ঘটনার বিস্তারিত খুলে বলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

এক রেওয়ায়েতে হযরত খালেদ (রা.)-এর মদিনায় উপস্থিত হওয়ার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খালেদ (রা.) সেই যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদিনায় আসেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। তিনি যখন মসজিদে আসেন তখন হযরত উমর (রা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি এক মুসলমানকে হত্যা করেছ।উপরন্তু তার স্ত্রীকে হস্তগত করেছ। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব। সেই মুহূর্তে হযরত খালেদ (রা.) মুখ দিয়ে টু শব্দ করেন নি, কেননা তিনি ধারণা করেছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ধারণাও তা-ই। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন, পুরো বৃত্তান্ত খুলে বলেন এবং ক্ষমা চান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্ষমা করে দেন। হযরত আবু বকর (রা.)-কে সন্তুষ্ট করে তিনি উঠে চলে আসেন। হযরত উমর (রা.) মসজিদে বসা ছিলেন। খালেদ (রা.) বলেন, হে উম্মে শামলার পুত্র! আমার কাছে আসো, তোমার কী বলার আছে বল? হযরত উমর (রা.) বুঝতে পারেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই হযরত খালেদ (রা.) এভাবে কথা বলছেন। হযরত উমর (রা.) চুপচাপ উঠে নিজের ঘরে চলে যান এবং হযরত খালেদের সাথে আর কোন কথা বলেন নি। (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৪)

অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালেকের ভাই মুতাম্মিম বিন নুয়ায়রা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে নিজ ভাইয়ের রক্তপণ গ্রহণ করতে আসে এবং নিবেদন করে যে, আমাদের বন্দিদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। হযরত আবু বকর (রা.) বন্দিদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং অধ্যাদেশ লিখে দেন আর মালেকের রক্তপণ প্রদান করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন যে, তাকে যেন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং বলেন, তার তরবারি নিষ্পাপ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে উমর! এটি হতে পারে না। আমি সেই তরবারিকে, যা আল্লাহ্‌তা'লা কাফেরদের উদ্দেশ্যে খাপ থেকে বের করেছেন,পুনরায় খাপে ঢোকাব না।(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

হযরত আবু বকর (রা.) যেহেতু রক্তপণ আদায় করে দিয়েছেন অতএব শরীয়ত অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর আর কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। তাই হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এ বিষয়টি এখানেই শেষ কর।

মালেক বিন নুয়ায়রাকে হত্যা বিষয়ক যে অভিযোগ রয়েছে এর উত্তর প্রদান করতে গিয়ে হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (রহ.) তার তোহফায়ে আসনা আশারিয়া পুস্তকে লিখেন, আসলে যা ঘটেছে তার সঠিক ব্যাখ্যা ঐসকল লোক বর্ণনাকরে নি, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক অবস্থা জানা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করা অযৌক্তিক। সীরাত ও তারীখ তথা জীবনচরিত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য পুস্তকগুলোতে এই ঘটনার বিস্তারিত হলো, নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ আসাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান শেষে হযরত খালেদ (রা.) যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বুতাহ্-এর দিকে মনোযোগী হন তখন তিনি চতুর্দিকে সামরিক দল প্রেরণ করেন আর মহানবী (সা.)-এর আজ্ঞা ও পদ্ধতি অনুযায়ী তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, যে জাতি, গোত্র বা দলের ওপর অভিযান চালাবে, সেখানে যদি তোমরা আযান শুনতে পাও তাহলে সেখানে হত্যাযজ্ঞ বা খুনোখুনি থেকে বিরত থাকবে। আর যদি আযান না শোনা যায় তাহলে সেটিকে 'দারুল হার্‌ব' (তথা যুদ্ধক্ষেত্র) আখ্যা দিয়ে সেখানে পূর্ণ সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে। ঘটনাক্রমে উক্ত দলে জনাব আবু কাতাদা আনসারী (রা.)-ও ছিলেন যিনি মালেক বিন নুয়ায়রাকে পাকড়াও করে হযরত খালেদ (রা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন, যাকে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বুতাহ্-এর নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল আর তার আশেপাশের অঞ্চলের সদকা ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্বও তার ওপর ন্যাস্ত ছিল। জনাব আবু কাতাদা (রা.) আযান শোনার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন,কিন্তু সেই দলেরইএক দল লোক বলে যে, আমরা আযানের ধ্বনি শুনি নি, কিন্তু এর পূর্বেই আশেপাশের নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে সুনিশ্চিতও প্রমাণিত বিষয় হিসেবে জানা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সংবাদ শুনে মালেক বিন নুয়ায়রা-রপরিবারের সদস্যরা খুব আনন্দোৎসব করেছিল; মহিলারা হাতে মেহেদি লাগিয়েছিল, ঢাক-ঢোল বাজিয়েছিল এবং অনেক বেশি আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেছিল এবং মুসলমানদের এই বিপদ দেখে খুব খুশি হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি বিষয় ঘটে; মালেক বিন নুয়ায়রাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মহানবী (সা.) সম্পর্কে তার মুখ দিয়ে এমন বাক্যাবলী বের হয় যা কাফের ও মুরতাদরা নিজেদের আলাপচারিতায় (ব্যবহার করতে) অভ্যস্ত ছিল এবং ব্যবহার করতো। অর্থাৎ,'ক্বালা রাজুলুকুম আও সাহেবুকুম' যার অর্থ হলো, 'তোমাদের লোক বা তোমাদের সাথী এমনটি বলেছে'। এছাড়া এই বিষয়টিও প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে মালেক বিন নুয়ায়রা আদায়কৃত যাকাতও নিজ গোত্রকে একথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল যে,'ভালোই হয়েছে! এই ব্যক্তির মৃত্যুতে তোমরা বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছ!' এসব ঘটনা এবং তার কথাবার্তার ধরন প্রত্যক্ষ করে হযরত খালেদ তার মুরতাদ হবার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যান এবং তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। মদিনায় যখন এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছে এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আবু কাতাদাও রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছেন আর হযরত খালেদকেই দোষী সাব্যস্ত করেন, তখন প্রথমে হযরত উমর ফারুকেরও এই ধারণাই হয়েছিল যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং কিসাস (বা হত্যার প্রতিশোধ) গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.), হযরত খালেদকে তলব করে ঘটনা তদন্ত করেন, তার কাছে (ঘটনার) পুরো বিবরণ জিজ্ঞেস করেন এবং প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনার রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়; তখন তিনি তাকে নির্দোষ আখ্যা দেন এবং তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে স্বপদে বহাল রাখেন।

(তোহফা ইসনা আশারাহ, পৃ: ৫১৭-৫১৮)

মালেক বিন নুয়ায়রার হত্যার বিষয়ে আরেকজন লেখক লিখেছেন যে, মালেক বিন নুয়ায়রা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলোতে অনেক বেশি অসামঞ্জস্য রয়েছে। তার সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে সেগুলোতে অনেক মতানৈক্য রয়েছে যে, সে কি নির্যাতিত অবস্থায় নিহত হয়েছিল নাকি সে হত্যাযোগ্য ছিল?

মালেক বিন নুয়ায়রাকে যে জিনিষটি ধ্বংস করেছিল তা হলো, তার অহংকার, দাম্ভিকতা ও ধর্মত্যাগ। তার মাঝে অজ্ঞতা রয়ে গিয়েছিল, নতুবা মহানবী (সা.)-এর পর রসূলের খলীফার আনুগত্য ও বায়তুল মালের প্রাপ্য যাকাত প্রদানে সে টালবাহানা করতো না। তিনি লিখেন, আমার ধারণামতে এই ব্যক্তির দলপতি হবার ও নেতাগিরির শখ ছিল, সেইসাথে বনু তামীম গোত্রের নেতাদের মধ্যে নিজের কতিপয় সেসব নিকটাত্মীয়ের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল যারা ইসলামী খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছিল। [অর্থাৎ, যারা খিলাফতের আনুগত্য বরণ করেছিল এবং যাকাত প্রভৃতি প্রদান করছিল-তাদের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল।] তার কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড উভয়ই এই মতামতের সমর্থন করে। তার মুরতাদ হওয়া এবং সাজাহ্-র সাথে হাত মেলানো, যাকাতের উট নিজের লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া, আবু বকর (রা.)-এর কাছে যাকাত প্রেরণে বাধা দেয়া, বিদ্রোহ ও অপরা ধের ক্ষেত্রে নিজ মুসলমান নিকটাত্মীয়দের উপদেশ না শোনা- এসবকিছু তার অপরাধ সাব্যস্ত করে। আর এসবকিছু থেকে প্রতীয়মান হয়যে, এই ব্যক্তি ইসলামের চেয়ে কুফরের অধিক নিকটবর্তী ছিল। একদিকে সে(নিজেকে) মুসলমান বলে দাবি করতো, অন্যদিকে কুফরের নিকটবর্তী ছিল। মালেক বিন নুয়ায়রার বিরুদ্ধে অন্য কোন অকাট্য প্রমাণ নাপাওয়া গেলেও, কেবল তার যাকাত আটকে রাখাই তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

প্রথম যুগের (গবেষকদের) কাছে এটি প্রমাণিত সত্য ছিল যে, সে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ইবনে আব্দুস সালামের পুস্তক 'তাবাকাতে ফুখুল শু'আরা'-তে বর্ণিত হয়েছে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, খালেদ মালেকের সাথে আলোচনা করেন এবং তার মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মালেক যদিওনামাযের কথা স্বীকার করে; [অর্থাৎ, সে বলে, নামায পড়ব;] কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে। আর মুসলিম শরীফের ভাষ্যে ইমাম নববী মুরতাদদের সম্পর্কে বলেন, এদেরই মাঝে এমন লোকজনও ছিল যারা যাকাতের কথা স্বীকার করতো এবং তা প্রদান করা বন্ধ করে নি, কিন্তু তাদের নেতারা তাদেরকে একাজে বাধা দেয়। কিছু লোক নামাযের মতোই যাকাতও প্রদান করতে চাইতো, যাদের জন্য যাকাত দেওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু নেতারা তাদের বাধা দেয় এবং তাদের হাত ধরে রেখেছিল, যেমন বনু ইয়ারবূ। তারা তাদের যাকাত সংগ্রহকরে সেগুলো হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করতে চাচ্ছিল কিন্তু মালেক বিন নুয়ায়রা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের যাকাতের সম্পদ মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) মালেক বিন নুয়ায়রার বিষয়ে পুরো তদন্ত করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মালেক বিন নুয়ায়রাকে হত্যা করার অপরাধ থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) মুক্ত। এ বিষয়ে মূল ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত ছিলেন এবং গভীর দৃষ্টি রাখতেন, কেননা তিনি (রা.) খলীফা ছিলেন আর সব সংবাদই তাঁর কাছে পৌঁছত। এছাড়া অন্য সবার চেয়ে তাঁর ঈমানও অনেক দৃঢ় ছিল। হযরত খালেদ (রা.)-র বিষয়টি সমাধা করার ক্ষেত্রে তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ করছিলেন। কেননা মহানবী (সা.) হযরত খালেদ (রা.)-র প্রতি যে দায়িত্বভারই অর্পণ করেছেন [তা থেকে তিনি (সা.) তাকে] কখনোই অপসারণ করেন নি, যদিও তার দ্বারা এমন কিছু কাজ সম্পাদিত হয়েছে যাতে তিনি (সা.) সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি (সা.) তার অজুহাত মেনে নিতেন আর মানুষকে বলতেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.) খালেদের অজুহাত মেনে নিতেন আর লোকদের বলতেন, খালেদকে কষ্ট দিও না, সে আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর মধ্য হতে একটি তরবারি যাকে আল্লাহ্ তা'লা কাফেরদের ওপর নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়াত ও কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর-আলি মহম্মদ সালাবী, প: ৩৩৩-৩৩৪)

এ প্রসঙ্গে আরেকটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, হযরত খালেদ (রা.) উম্মে তামীম বিনতে মিনহালকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়, যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই তিনি (রা.) লায়লা বিনতে মিনহালকে বিয়ে করেন আর ইদ্দত পার হওয়ারও অপেক্ষা করেন নি। এ বিয়ে সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থ তাবারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালেদ (রা.) উম্মে তামীম মিনহালের মেয়েকে বিয়ে করার পর তার পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। কেননা আরবরা যুদ্ধ চলাকালীন নারীদের সাথে মেলামেশা অপছন্দ করতো,আর কেউ এমনটি করলে তাকে ভর্ৎসনা করতো।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেন, তিনি, অর্থাৎ লায়লা বিনতে মিনহাল যখন হালালবা পবিত্রহন তখন হযরত খালেদ (রা.) তাকে বিয়ে করেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়াননাহাইয়াহ লি ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৮)

আল্লামা ইবনে খাল্লিকান লিখেন, উম্মে তামীম তিন মাস সময় অতিবাহিত করে তার ইদ্দতপূর্ণ করার পর হযরত খালেদ (রা.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন আর সে তা গ্রহণ করে।

(ওয়াফফিয়াতুল আইয়ান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০)

হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয দেহ্‌লভী এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে লিখেন, মূলত উক্ত ঘটনাটিই মনগড়া, কেননা কোন নির্ভরযোগ্য ও প্রত্যয়িত গ্রন্থে এর কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। কোন কোন অনির্ভরযোগ্য পুস্তকে এই রেওয়ায়েত পাওয়া গেলেও এর উত্তরও একই সাথে সেই রেওয়ায়েতেই বিদ্যমান রয়েছে যে, মালেক বিন নুয়ায়রা এই মহিলাকে অনেক দিন পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছিল। বলা হয় যে, (সে) মালেক বিন নুয়ায়রার স্ত্রী ছিল আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তাকে হত্যা করার পরপরই তাকে বিয়ে করেন। হত্যা করার মূল কারণই ছিল, তিনি বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন। যাহোক, তিনি বলেন, মালেক বিন নুয়ায়রা এই মহিলাকে অনেক দিন পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছিল। আর অজ্ঞতার যুগের (রীতির) অনুসরণে সে তাকে এমনিতেই বাড়িতে আটকে রেখেছিল। অজ্ঞতার যুগের এই প্রথা দূর করার জন্যই পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যে, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (সূরা আল্ বাকারা: ২৩৩) অর্থাৎ, তোমরা যখন স্ত্রী দের তালাক দিয়ে দাও আর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায় তখন তাদেরকে আটকে রেখো না। কাজেই, এই মহিলার ইদ্দত অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বিধায় বিয়ে বৈধ হয়ে গিয়েছিল।

(তোহফা ইসনা আশারাহ, অনুবাদ- খলীলুর রহমান নুমানী, পৃ: ৫১৮)

কেননা, সে (তাকে)তালাক দিয়ে নিজের বাড়িতে আটকে রেখেছিল।

হযরত খালেদ (রা.)-র বিয়ে সম্পর্কে আরেকজন লেখক লিখেন, উম্মে তামীমের নাম ছিল লায়লা বিনতে সিনান মিনহাল। সে মালেক বিন নুয়ায়রার স্ত্রী ছিল। তার সাথে হযরত খালেদ (রা.)-এর বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটে। অনেক ঝগড়াবিবাদ হতে থাকে আর অনেক তর্কবিতর্ক হয়। এর সারাংশ হলো, কিছু লোক হযরত খালেদ (রা.)-র ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি উম্মে তামীমের রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাকে ভালোবাসতেন। তাই ধৈর্য ধরতে পারেন নি আর বন্দি হিসেবে (তার করায়ত্তে) আসতেই তাকে বিয়ে করে ফেলেন। এর অর্থ হলো, নাউযুবিল্লাহ্; এটি বিয়ে নয় বরং ব্যাভিচার ছিল। কিন্তু এই বক্তব্য মনগড়া এবং সুস্পষ্ট মিথ্যা, এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রাচীন সাহিত্য বা উৎসে (অর্থাৎ, পুস্তক-পুস্তিকায়) এর প্রতি কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। (অর্থাৎ) যেসব রেওয়ায়েত বা উৎস রয়েছে (তাতেও) এমন কোন দলিল পাওয়া যায় না যদ্বারা (এটি) প্রমাণ হয়।

আল্লামা মাওয়ারদী বলেন, মালেক বিন নুয়ায়রাকে খালেদ (রা.) একারণে হত্যা করেছিলেন যে, সে যাকাত আটকে রেখেছিল, যার ফলে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে গিয়েছিল। আর এ কারণে উম্মে তামীমের সাথে তার বিবাহ অবৈধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া মুরতাদদের স্ত্রীদের বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশ হ লো, তারা যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগ দেয় তাহলে তাদের বন্দি করবে, হত্যা করবে না। যেভাবে ইমাম সারখাসী এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। উম্মে তামীম যখন বন্দি হিসেবে আসে তখন খালেদ (রা.) তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন আর সে ইদ্দত পূর্ণ করার পর তিনি তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়েন। অপরদিকে শেখ আহমদ শাকের এই বিষয়ের সাথে আরও(কিছু) কথা যুক্ত করেন, অর্থাৎ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, খালেদ (রা.) উম্মে তামীম এবং তার পুত্রকে ডান হাতের অধীনস্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তারা যুদ্ধবন্দি ছিল আর এমন মহিলাদের জন্য ইদ্দতের কোন (শর্ত) নেই। (যুদ্ধবন্দি মহিলা) যদি গর্ভবতী হয় তাহলে (সন্তান) প্রসব না করা পর্যন্ত তার মালিকের তার কাছে গমন করা অবৈধ। কিন্তু গর্ভবতী না হলে একবার ঋতুবতী হওয়া পর্যন্ত দূরে থাকবে। এটি শরীয়ত সম্মত এবং বৈধ। এক্ষেত্রে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু খালেদ (রা.)-র বিরোধী ও শত্রুরা এই সুযোগকে নিজেদের জন্য মোক্ষম সুযোগ জ্ঞান করেছে এবং এই অলীক আত্মপ্রসাদে নিপতিত হয় যে, মালেক বিন নুয়ায়রা মুসলমান ছিল আর খালেদ (রা.) তার স্ত্রীকে পাবার জন্য তাকে হত্যা করেছে। একইভাবে খালেদ (রা.)-র প্রতি এই অপবাদও আরোপ করা হয় যে, এই বিবাহের মাধ্যমে তিনি আরবের রীতিনীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছেন।

যেমন,উকাদের বক্তব্য হলো, মালেক বিন নুয়ায়রাকে হত্যা করে যুদ্ধক্ষেত্রেই তার স্ত্রীকে খালেদের বিয়ে করা অজ্ঞতা ও ইসলামী যুগে আরবের রীতি বহির্ভূত কাজ আর একইভাবে মুসলমানদের রীতিনীতি এবং ইসলামী শরীয়তের বিধিনিষেধেরও লঙ্ঘন। উকাদের এই বক্তব্য একেবারেই সত্য বিবর্জিত। প্রাক ইসলামিক যুগে আরবে বহুবার এমনটি হয়েছে যে, যুদ্ধ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর তারা মহিলাদের বিয়ে করতো আর একাজে তারা গর্ববোধ করতো। ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী এ সম্পর্কে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে (বুঝা যায় যে,) খালেদ (রা.) একটি বৈধ কাজই করেছেন আর এজন্য শরীয়তসম্মত বৈধ রীতি অবলম্বন করেছেন। এছাড়া এমন কাজ তো সেই (মহান) সত্তার পক্ষ থেকেও প্রমাণিত যিনি খালেদ (রা.)-র তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যদি খালেদ (রা.)-র ওপর এই আপত্তি করা হয় যে, তিনি যুদ্ধ চলাকালে বা এর অব্যবহিত পরে বিয়ে করেছেন তাহলে মহানবী (সা.) মুরাইসির যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জুয়ায়রা বিনতে হারেসকে বিয়ে করেছিলেন। আর এটি তার জাতির জন্য অনেক কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, এই বিয়ের ফলে তার বংশের একশ' লোককে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, কেননা তারা মহানবী (সা.)-এর শ্বশুরকুলের আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া এই বিয়ের আশিসপূর্ণ প্রভাবের মধ্যে এটিও ছিল যে, তার পিতা হারেস বিন যেরার মুসলমান হয়ে যান। অনুরূপভাবে খায়বারের যুদ্ধের পরক্ষণেই মহানবী (সা.) সাফিয়া বিনতে হুয়ী বিন আখতাবকে বিয়ে করেন। কাজেই, এক্ষেত্রে যখন মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে তখন ভর্ৎসনা ও নিন্দার কোন কারণ নেই।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৩৩৪-৩৩৬)

অকারণে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপ করা হবে। এই বিশদ আলোচনা আমি এজন্য করছি কেননা কোন কোন স্বল্পজ্ঞানী আজও এই প্রশ্নের অবতারণা করে আর তারা মূলত হযরত আবু বকর (রা.)-র প্রতি এই আপত্তি করে। অর্থাৎ,এক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) সঠিক ছিলেন,কিন্তু নাউযুবিল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রা.) ন্যায়সঙ্গাত কাজ করেন নি আর অন্যায়ভাবে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে সমর্থন করেছেন। অথচ হযরত আবু বকর (রা.) পুরো ঘটনা যাচাই করেন এবং তদন্ত করার পর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন আর এসব অপবাদ থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে মুক্ত করেন।

হযরত খালেদ (রা.)-র ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি যেন আসাদ ও গাতফান গোত্র এবং মালেক বিন নুয়ায়রা প্রমুখকে দমন করার পর ইয়ামামাঅভিমুখে যাত্রা করেন আর এজন্য অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ প্রদান ক রেছিলেন। শরীক বিন আবদা ফুযারী বর্ণনা করেন যে, আমি বুযাখা-র অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.)-র সমীপে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে খালেদ (রা.)-র নিকট প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ (রা)-র নামে আমার সাথে একটি পত্র ছিল যাতে লেখা ছিল, পরসমাচার! তোমার বার্তবাহক মারফত তোমার পত্র পেয়েছি। এতে তুমি বুযাখা-র যুদ্ধে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয় এবং সাহায্য ও সমর্থনের উল্লেখ করেছ। আর আসাদ ও গাতফান (গোত্রে)-র সাথে তুমি যা করেছ তা-ও উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া তুমি লিখেছ যে, আমি ইয়ামামা অভিমুখে যাত্রা করছি। তোমার জন্য আমার উপদেশ হলো, (তুমি) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করবে আর তোমার সাথে যেসব মুসলমান রয়েছে তাদের প্রতি কোমলতাপ্রদর্শন করবে। তাদের সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করবে। হে খালেদ সাবধান! বনু মুগীরার অহংকার ও দাম্ভিকতা থেকে আত্মরক্ষা করবে। আমি তোমার সম্পর্কে তাদের পরামর্শ শুনি নি যাদের কথা আমি কখনো উপেক্ষা করি না। কাজেই, তুমি যখন বনু হানীফাকে মোকাবিলার জন্য অবতীর্ণ হবে তখন সাবধান থাকবে। স্মরণ রেখো! এখনও পর্যন্ত বনু হানীফার মতো অন্য কারো মুখোমুখি তুমি হও নি। তারা সবাই তোমার বিরোধী এবং তাদের দেশ অনেক বড়। অতএব, সেখানে পৌঁছে তুমি স্বয়ং সেনাবাহীনির নেতৃত্বভার পালন করবে। (সেনাদলের) ডান দিকের দায়িত্বে একজন, বাম দিকের দায়িত্বে একজন এবং অশ্বারোহীদের ওপর একজনকে নিযুক্ত করবে। মুহাজের ও আনসারদের মাঝ থেকে যেসব জ্যেষ্ঠ সাহাবী তোমার সাথে আছেন তাদের কাছ থেকে নিয়মিত পরামর্শ নিবে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে সম্মান করবে। শত্রুরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয় তখন তাদের ওপর পূর্ণ প্রস্তুতিসহ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিরের বিপরীতে তির, বর্শার বিপরীতে বর্শা এবং তরবারির বিপরীতে তরবারি (দ্বারা আক্রমণ করবে)। তাদের বন্দিদেরকে তরবারির জোরে তুলে আনবে। হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে তাদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করবে। তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবে। সাবধান! আমার আদেশ অমান্য করবে না। পুনরায় তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

এই পত্র পাওয়া মাত্রই খালেদ (রা.) তা পাঠ করে বলেন, আমরা শুনেছি আর আমরা এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করব। খালেদ (রা.) নিজের সাথে মুসলমানদেরকেও প্রস্তুত করেন এবং বনু হানীফা, অর্থাৎ মুসায়লামা বা মুসায়লামা কায্যাব যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আনসারদের আমীর নিযুক্ত ছিলেন, সাবেত বিন কায়েস বিন শিমাস। পথিমধ্যে যেসব মুরতাদ সামনে পড়েছে তাদেরকে তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন। অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.) খালেদ (রা.)-র নিরাপত্তার খাতিরে পেছন থেকে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যেন খালেদ (রা.)-র বাহিনীকে পেছন থেকে কেউ আক্রমণ করতে না পারে। ইয়ামামার পথে খালেদ (রা.) অনেক বেদুঈন গোত্র অতিক্রম করেন যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের সাথে যুদ্ধ করে (তিনি) তাদেরকে ইসলামে ফিরিয়ে আনেন। পথিমধ্যে সাজাহ্'র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদের দেখা পেলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, অর্থাৎ; তাদেরকে হত্যা করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। এরপর ইয়ামামার ওপর আক্রমণ করেন।

ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে তুলে ধরা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

****

সাতের পাতার পর.....

থেকে ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্তে এসে এর সরলীকৃত কিছু অংশ তরল হয়ে সোজা হৃদপিণ্ডে পৌঁছয় এবং শিরায় পৌঁছানো মাত্রই তা দুধে পরিণত হয়। এর আরও একটি সূক্ষ্ম অংশ সরাসরি যকৃতে পৌঁছয় এবং শিরা-উপশিরার মাধ্যমে হৃদপিণ্ডে গিয়ে তা রক্তে পরিণত হয়। এরপর সেই রক্ত যখন ওলানের কাছাকাছি পৌঁছয় তখন সেখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করে রেখেছেন যে সেই রক্ত দুধে পরিণত হয়।

এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রাচীন যুগের মানুষ এতটাই অনভিজ্ঞ ছিল যে, তফসীরকারকগণ এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন এবং প্রচলিত চিন্তাধারা অনুসারে মনে করা হয়েছে যে, হয়তো তরল খাদ্য এবং রক্ত তৈরীর মাঝে এমন কোনও পরিবর্তন হয় যা থেকে দুধ উৎপন্ন হয়। কাশফ দ্রষ্টা এক বুজুর্গ লেখেন-খাদ্য যখন প্রাণীদেহের যকৃতে যায় তখন তার নিচের অংশটুকু মল, মাঝের অংশটুকু দুধ এবং উপরের অংশটুকু রক্তে পরিণত হয়। অথচ এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, তরল খাদ্য ও রক্তের মধ্য দিয়ে দুধের উপাদান তৈরী হয়। অর্থাৎ প্রথমে তা তরল খাদ্য রূপে থাকে। অতঃপর তা রক্ত ও দুধে পরিণত হয়। প্রথমোক্ত দুটি বস্তুকে মানুষ সানন্দে খেতে প্রস্তুত হয় না। গোবর কিম্বা রক্ত, মানুষ কোনওটাই খেতে রাজি হয় না। কিন্তু সেই রক্তই যখন দুধে পরিণত হয় তখন বেশ তৃপ্তিসহকারে খায়। এর মধ্যে কোনও প্রকার অশুদ্ধি বা বিষাক্ত পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না।

এই আয়াতের এই অর্থ নয় যে, কেউ সামান্য পরিমাণও দুধও তৈরী করতে পারবে না। হয়তো কোনও দিন মানুষ কিছু পরিমাণ দুধ তৈরী করতে সক্ষম হয়েও গেল, কিন্তু এভাবে তারা সমগ্র পৃথিবীকে খাদ্য হিসেবে পৌঁছে দিতে পারবে না। এমনিতেও তো মানুষ গ্যাস থেকে পানি উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সেই সামান্য জল বৃষ্টির জলের কাজ করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনও ব্যক্তি যদি ঘাস ও লতাপাতা থেকে দুধ তৈরী করেও নেয় তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু পৃথিবীর জন্য খাদ্য হিসেবে তা তুলে ধরতে সেই দুধ উৎপাদনকারী পশুদের উপরই নির্ভর করতে হবে , যেভাবে পানির জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়।

এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ খাদ্যকে দুষিত করতে পারে, কিন্তু তা থেকে দুধ তৈরী করতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষ নবীদের শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলে কিন্তু তার মস্তিষ্কে বিদ্যমান অমার্জিত সত্য যা তার প্রকৃতির অংশ, সেটিকে সে নিষ্কলুষ ও উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক শিক্ষায় রূপান্তরিত করতে পারে না।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯২)

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন। আমরা সেই সব বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছি আর এই যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছি। যেমনটি বয়আতের ষষ্ঠ শর্তে উল্লেখ রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন- কুপ্রথার অনুসরণ এবং রিপুর দাসত্ব থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ চেষ্টা করতে হবে কুপ্রথা থেকে বিরত থাকার এবং রিপুর কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার। অতএব, অল্পে তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ থাকার উপর গুরুত্ব দিন। এই শর্তটি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদীর জন্য। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের সাধ্যানুসারে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। "

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৫)

(রিশতা নাতা বিভাগ, নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান)

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। **(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আহমদীদের করণীয়– হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর নির্দেশাবলীর আলোকে।

সূচনালগ্ন থেকেই সত্য ও অসত্য ,আলো ও অন্ধকারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রীতি অনুযায়ী চিরকাল আলোক তথা সত্যেরই জয় হয়েছে। কিছু মানুষ সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য খোদা তায়ালার রসুলের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অসফল ও অকৃতকার্য হয়। তারা ইসলাম ও হযরত মহম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে তারা অনেক অবমাননাকর আপত্তি করে অনেক অভব্য আচরণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার সুন্নত অনুযায়ী অসফলতায় ব্যর্থ মনোরথ হয়। সম্প্রতিও অভিব্যক্তি ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার ছুতোয় কিছু উপাদান ইসলাম ও আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্বেষ উজাগর করতে এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে অশ্লীল কার্টুন বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশিত করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও ইসলামী দেশগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। অগ্নি সংযোগ ঘটানো হয়েছে , ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ভাংচুরও করা হয়েছে।

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হল খোদা তায়ালার কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তার ঘটানো। এই কারণে এই সকল ক্ষেত্রে জামাতের প্রতিক্রিয়া অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর প্রদর্শনের পরিবর্তে নিন্দুকদের আপত্তি সমূহের সন্তুষ্টিজনক উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

তাই জামাতের আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) বর্তমানের এই ঘটনাক্রম সম্পর্কে খুতবা জুমায় বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করেন যা তিনি ১০ ফেব্রুয়ারী , ১৭ ফেব্রুয়ারী ,২৪ ফেব্রুয়ারী , ৩রা মার্চ ও ১০ মার্চ ২০১৪ মসজিদ বায়তুল ফুতুহ , লন্ডন –এ প্রদান করেছিলেন । বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন প্রকৃত মোমিনের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া বাঞ্ছনীয় আর এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় এই খুতবাগুলি থেকে সে সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। খুতবাগুলি থেকে চয়নকৃত অংশ উপস্থাপন করা হল।

আঁ হযরত (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন কর

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, এই ধরণের আচরণকারীদেরকে বোঝাও, তাদের সামনে আঁ হযরত (সাঃ) এর সৌন্দর্য্যাবলী বর্ণনা কর। পৃথিবীবাসীকে ঐসকল সুন্দর ও উজ্বল দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত কর যেগুলি জগতের অগোচরে রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া কর যে, আল্লাহ তাদেরকে যেন এই সকল আচরণ থেকে বিরত রাখে অথবা নিজেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন।আল্লাহ তায়ালার শাস্তি দান করার নিজস্ব রীতি আছে। তিনি উত্তম জানেন যে, তিনি কিভাবে শাস্তি প্রদান করবেন। অপরদিকে দ্বিতীয় খিলাফতের সময় “রঙ্গীলা রসুল ” নামে অত্যন্ত জঘন্য এক পুস্তক লেখা হয়। ‘বর্তমান’ নামে আরও একটি পত্রিকা একটি জঘন্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করে যার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিকে মুসলমানদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ছিল এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল। এই প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন “হে ভাইয়েরা! আমি বেদনার্ত হৃদয়ে পুনরায় আপনাদেরকে বলছি যে, যোদ্ধা সেই ব্যক্তি নয় যে মারামারি শুরু করে দেয়। সে কাপুরুষ কেননা সে তার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছে।” (হাদিস অনুযায়ী ক্রোধদমনকারী প্রকৃত যোদ্ধা।) তিনি বলেন “ বাহাদুর সেই, যে স্থায়ীরূপে সংকল্প করে নেয় এবং যতক্ষন পর্যন্ত না সেটা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় পশ্চাদ পদ হয়না।তিনি বলেন যে, ইসলামের উন্নতির জন্য তিনটি বিষয়ে অঙ্গীকার বদ্ধ হও। প্রথম এই যে,আপনি খোদা ভীরুতার সঙ্গে কাজ করবেন এবং দ্বীনকে উদাসীনতার দৃষ্টিতে দেখবে না। প্রথমে নিজের কর্ম যথাযথ কর। দ্বিতীয় হল এই যে, ইসলাম প্রচারে পূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ করবে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অবহত হয়। আঁ হযরত (সাঃ) এর গুণাবলী, সৌন্দর্য্য ও অনিন্দ সুন্দর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে লোক অবগত হয়।

তৃতীয় এই যে, মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পূর্ণ চেষ্টা করবে।

(আনওয়ারুল উলুম, নবম খন্ড পৃঃ ৫৫৫–৫৫৬)

এখন প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানেরও এবং মুসলমান নেতাদেরও এটা কর্তব্য। লক্ষ্য করুন এই সকল মুসলমান দেশগুলি যারা স্বাধীন দেশরূপে গণ্য, স্বাধীন হওয়া সত্বেও এখনও পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শিকার, এই সকল পশ্চিমা জাতিগুলির কৃপার পাত্র। তাদের অনুকরণ করে চলেছে। নিজেরা কাজ করবেনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উপর আমরা নির্ভরশীল। আর এই কারণেই এরা সময়ে সময়ে মুসলমানদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলাও করে থাকে।এছাড়া তিনি(রাঃ) সীরাতুন্নবী (সাঃ) এর জলসারও সূচনা করেন। তাই এটা হল বিরোধ প্রদর্শন করার আসল পদ্ধতি, এরকম ভাংচুর প্রদর্শন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়। এই সকল বিষয় গুলি যেগুলি তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন সেগুলি সব থেকে বেশি আহমদীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন। এই সকল দেশগুলির কিছু ত্রুটিপূর্ণ রীতিনীতি অজ্ঞাতসারে আমাদের কিছু পরিবারে অনুপ্রবেশ করছে।আমি আহমদীদেরকে বলছি যে, আপনাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছিল। তাদের সংস্কৃতির ভাল জিনিসগুলি গ্রহণ কর। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ বিষয় গুলি থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত থাকতে হবে।অতএব আমাদের প্রতিক্রিয়া এটাই হওয়া উচিত যে, কেবলমাত্র ভাংচুর প্রদর্শন না করে আমাদের আত্মপর্যালোচনা করার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদের নিজেদের আমলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেখা উচিত আমাদের মধ্যে কতটা খোদাভীরুতা রয়েছে, তাঁর ইবাদতের দিকে কতটা মনোযোগ রয়েছে। ধর্মীয় আদেশাবলী পালনকরা ও আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে কতটা মনোযোগ রয়েছে।

আবার দেখুন খিলাফতে রাবেয়ার যুগে রুশদি অত্যন্ত অবমাননাকর পুস্তক লেখে।সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ) খুতবাও প্রদান করেছিলেন এবং একটি পুস্তকও রচনা করিয়েছিলেন। আর আমি যেরূপ বলেছি যে, এরকম কার্যকলাপ সংঘটিত হতেই থাকে। গত বছরের শুরুতেও আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনী সম্পর্কে এই ধরনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। সেই সময়ও আমি জামাতকে এবং অঙ্গ সংগঠনগুরি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, প্রবন্ধ ও পত্র লিখুন, যোগাযোগ বাড়ান।আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনীর সুন্দর আঙ্গিক গুলি তাদের সম্মুখে বর্ণনা করুন। অতএব এটা আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনের সুন্দর দিকগুলিকে জগতকে দেখাবার বিষয়, যেটা ভাংচুর প্রদর্শন দ্বারা অর্জিত হতে পারেনা।তাই প্রত্যেক শ্রেণীর আহমদীকে প্রত্যেক দেশে অপরাপর শিক্ষিত ও বিবেক সম্পন্ন মুসলমানদেরকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে তাদের সম্মত করতে হবে যে, তারাও যেন এরূপ শান্তি পূর্ণ পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, নিজেদের সম্পর্ক বিস্তার করে এবং প্রবন্ধ লিলে। তাহলে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক স্তরে শেষ ‘হুজ্জত’ (চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠা) পূর্ণ হয়ে যাবে, এর পর যারা এমন করবে তার বিষয় খোদা তায়ালার উপর ন্যস্ত হবে।

আল্লাহ তায়ালা আঁ হযরত(সাঃ) কে রহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন।

যেরূপ তিনি স্বয়ং বলেছেন – “ আমরা তোমাকে কেবল সমস্ত জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।”

এবং তাঁর চাইতে বড় সত্তা, দয়া প্রদর্শনকারী সত্তা না কখোনো জন্ম নিয়েছে না ভবিষ্যতে জন্মাবে। কিন্তু তাঁর আদর্শ চিরকাল থাকবে।এই আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত।এর জন্যও সব থেকে বেশি দায়িত্ব আমরা আহমদীদের উপর ন্যস্ত হয়। তাই অবশ্যই আঁ হযরত (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন ছিলেন।আর এরা তাঁর এমন চিত্র উপস্থাপন করছে যার দ্বারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হয়।

অতএব আমাদের কর্তব্য আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালাবাসা, সম্প্রীতি এবং দয়ার আদর্শকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা। আর এটা পরিস্কার যে, এটা করতে হলে মুসলমানদের নিজেদের চাল চলন পরিবর্তন করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের তো প্রশ্নই আসেনা আঁ হযরত (সাঃ) তো সর্বদা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষন না তাঁর উপর মদিনা এসে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে প্রতিরক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও আল্লাহতায়ালার আদেশ ছিল, “হে মুসলমানেরা তোমরা তাদের সহিত যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন কোরোনা।নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। আর আঁ হযরত(সাঃ) তাঁ উপর অবতীর্ণ বিধানের উপর সব থেকে বেশি

এরপর ১১ পাতায়

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

ওয়াকফে নওদের ক্লাসে হুযুরের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: অনেক সময় গর্ভস্থ শিশু যখন কোষাকারে থাকে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে তাকে। এ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি সেই গবেষণা মানুষের কোনও উপকার করে, ভবিষ্যতে জন্ম নেওয়া শিশুরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সে সম্পর্কে জানা যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করলে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু মাতৃগর্ভে শিশুর যখন বৃদ্ধি শুরু হয়ে যায় তখন তাকে হত্যা করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন: ইমাম নামায পড়ানোর সময় তিন রাকাতের পরিবর্তে যদি দুই রাকাত পড়িয়ে দেয়, তবে কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: একবার সুবহানাল্লাহ্ বল। ইমাম শুনে নিলে ভাল কথা। অন্যথায় চুপ থাকুন, বার বার বলবেন না। প্রথম থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সারি এবং ক্রমে তৃতীয় সারি সুবহানাল্লাহ্ বলতে শুরু করলেন, এমনটি যেন না হয়। এভাবে বার বার বললে ইমাম এমনিতেই ভুলে যাবে যে কি করতে হবে আর কি ভুল হয়েছে। নামাযে কিছু বলা যাবে না, এর অনুমতি নেই। এর জন্য একবার সুবহানাল্লাহ্ বলাই যথেষ্ট। ইমাম বুঝতে পারলে ভাল, আর যদি মনে না থাকে তবে চুপ থাকুন আর ইমাম যখন সালাম ফিরে তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে তিনি দুই রাকাত পড়িয়েছেন, তিন রাকাত পড়তে পারেন নি। তখন ইমাম সালাম ফেরার পর পুনরায় উঠে দাঁড়াবে এবং কে রাকাত পড়িয়ে দিবে। সকলে তার সঙ্গে নামায পড়বে আর সেই রাকাতের পর যখন সালাম ফেরার সময় হবে, তখন এর পূর্বে সিজদা সহুর দুটি সিজদা করবে,অতঃপর সালাম ফিরবে। তাই ইমামকে একবার মনে করিয়ে দিবেন। অনেক সময় ইমাম বিহ্বল হয়ে পড়ে। অনেক সময় লোকে এমনভাবে সুবহানাল্লাহ্ বলতে শুরু করে যে আমিও বুঝতে পারি না কোথায় ভুল করলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একবার এমন ঘটনা ঘটল যে, কেউ কিছু বলল না। আমি মগরিবের নামাযে দুই রাকাত পড়িয়ে সালাম ফিরে দিলাম। এরপর নামাযীরা বলল,আপনি তো দুই রাকাত পড়ালেন।আমি বললাম, বেশ আরও এক রাকাত পড়ে নিচ্ছি। এমনটা হয়ে যায়, প্রত্যেকের হয়। আঁ হযরত (সা.)ও একবার চার রাকাতের পরিবর্তের পাঁচ রাকাত নামায পড়িয়েছিলেন। সাহাবাগণ কিছু বলেন নি। পরে কেউ বলল, নামাযের বিষয়ে কি কোনও নতুন আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে? আঁ হযরত (সা.) বললেন, না এমন কিছু না। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি তো পাঁচ রাকাত নামায পড়িয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমাকে সুবহানাল্লাহ্ বলে মনে করিয়ে দিতে। সকলেই ভুলতে পারে। কিন্তু ইমামের যদি মনে পড়ে তবে ভাল কথা, অন্যথায় সালাম ফেরার পর নামাযের পরিত্যক্ত অংশ পূর্ণ করা হবে।

প্রশ্ন: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করছি। আগামী বছর ইনশা্আল্লাহ্ কোর্স সমাপ্ত হবে।এখন কি আমি মাস্টার্স ডিগ্রির কোর্স করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অবশ্যই কর, কিন্তু কোন বিষয়ে করবে?

ছেলেটি উত্তর দেয়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কন্সট্রাকশনে স্পেলাইজেশন করার ইচ্ছে ছিল। এটা মসজিদ এবং অট্টালিকা আদি নির্মাণের কাজে আসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ভাল কথা, করুন। জার্মানীতে পাঁচ বছরে যতগুলি মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য ছিল, তার মধ্য থেকে কুড়ি বছরে পঞ্চাশটিও তৈরী হয় নি। এখন অনেক সময় আছে আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও তৈরী করতে থাকতে হবে। এমন ডিজাইন কর যা সুলভ হয়। আর এ নিয়েও গবেষণা করা উচিত যে কোন্ কোন্ উপাদান দিয়ে তৈরী করলে তা বেশি টেকসই হবে। এখন এরা প্রি ফেব্রিকেটেড মেটিরিয়াল ব্যবহার করছে যার ফলে মসজিদ তৈরীর খরচ অর্ধেক হয়ে গেছে। কিন্তু এটাও দেখতে হবে এটা কতটা মজবুত আর এর আয়ু কত? আর এ নিয়েও গবেষণা করা উচিত যে কিভাবে আমরা কম খরচে বেশি সংখ্যক মসজিদ তৈরী করতে পারি।

প্রশ্ন: আমি দুটি কথা বলতে চাই। প্রথম কথাটি হল, আমার পিতা সব সময় বলতেন, কোনও কাজ করতে হলে যুগ খলীফার কাছ থেকে অবশ্যই অনুমতি নিবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি তো ওয়াকফে নও, আর আপনার জন্য এমনিতেই জরুরী। বাকি সাধারণ মানুষদের জন্য আবশ্যক নয়।

ওয়াকফে নও যুবকটি নিবেদন করে, আমি শিক্ষকতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বেসিন প্রদেশে পাঠ্যক্রম প্রস্তুত আর আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে তা তৈরী করা হয়েছে যা স্কুলগুলিতে পড়ানো হবে। এখন আমি ইসলামিক বিষয়ে পড়াশোনার আগ্রহ রাখি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বেশ, আপনি ইসলামিক স্টাডি করুন আর পরে আমাকে জানিয়ে দিন যে আপনার পড়াশোনা সম্পূর্ণ হয়েছে আর এখন কি যদি স্কুলে সুযোগ হয় তবে সেখানে পড়ানোর অনুমতি আছে কি না? কিম্বা এখন জামাতের তো কোনও স্কুল নেই, কিন্তু যখন জামাত স্কুল খুলবে, তখন সেখানে পড়াবেন।

সেই ওয়াকফে নও যুবকটি একটু মোটাসোটা। হুযুর তাঁকে বলেন, একটু ছোটাছুটি করুন, শরীরচর্চা করুন। তোমার বয়স এখন ২৪ বছর, এখন শরীরচর্চার প্রয়োজন বেশি।

সেই ওয়াকফে নও যুবকটিই জানায় যে, গত বৃহস্পতিবার তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তাই তার জন্য দোয়ার আবেদন করেন আর নিজের জন্যও দোয়ার আবেদন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আপনার পিতার বাসনা এবং দোয়াসমূহকে আপনার পক্ষে কবুল করুন। আমীন।

প্রশ্ন: কোন পরিস্থিতিতে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) হতে পারে আর কতদিন পর্যন্ত আমরা নিরবধি নামায কসর করে পড়তে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি ভ্রমণরত অবস্থায় থাকলে নামায কসর করবেন। যেমন বর্তমানে আমি ভ্রমণরত তাই নামায কসর করছি। ১৪-১৫ দিন পর্যন্ত আপনি কসর করতে পারেন। কিন্তু কতদিন ভ্রমণরত থাকবেন তা যদি জানা না থাকে, যেমন আপনি চার পাঁচ দিন ভ্রমণরত আছেন, আরও চার পাঁচ দিন কোনও কাজের জন্য থাকতে হতে পারে, তখন আপনি কসর করবেন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) -এর সঙ্গে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। কয়েকদিনের সফর ছিল, তিনি নামায কসর করছিলেন। দুই মাস পর্যন্ত তাঁর যাত্রাকাল দীর্ঘায়িত হয়ে যায় আর তিনি নামায কসর করেন। এটা তখনই হয় যখন আপনি সফর করেন। সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে কসর করবেন। তবে সফরে যদি ১৪ দিনের বেশি সময় অবস্থান করতে হয় তবে আমি কসর করি না।

প্রশ্ন: এখানে ভারত বিভাজন নিয়ে কথা হয়। শিক্ষকরা বলেন, এটা মানুষের জন্য এটা ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। কেননা, ৫০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। লোকে যদি এ নিয়ে কথা বলে তবে কি বলা উচিত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিভাজনের পূর্বেই হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গা বেঁধে গিয়েছিল। কংগ্রেস লীগ ছিল, হিন্দু ও মুসলমানেরাও ছিল। তারা যদি একত্রে থাকত তবে ভাল ছিল। কিন্তু সেই সময় যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, তাতে সকলেই দেখতে পাচ্ছিল যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। মারামারি, খুনোখুনি তখনও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ভিতর ভিতর শত্রুতা বাড়ছিল। এর পরিণাম এই হল যে, যখন বিভাজন হল তখন তা সবেগে বেরিয়ে এল। আর খুনোখুনি ও মারামারি এই কারণেই হয়েছিল। আর যতসংখ্যক মুসলমান নিহত হয়েছিল তার তুলনায় হিন্দু ও শিখ কম নিহত হয়েছিল। তারা মুসলমানদের বেশি হত্যা করেছিল। মুসলমানেরাও অত্যাচার করেছে, কিন্তু হিন্দুদের তুলনায় কম ছিল। মুসলমানেরা শুরুতে এভাবে দেশভাগ হতে দিতে চায় নি। পরে সমস্ত পরিস্থিতি দেখে অবশেষে বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে মুসলমানদের একটি পৃথক দেশ হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে এই নিশ্চয়তা দেয় দিয়েছিল যে মুসলমানদের দেশ হিসেবে যে পাকিস্তান গঠন হবে ধর্ম তার ভিত্তি হবে না। বরং যে পাকিস্তানের নাগরিকদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক মুসলমান নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিবে, প্রত্যেক হিন্দু নিজেকে হিন্দু হিসেবে এবং প্রত্যেক শিখ নিজেকে শিখ হিসেব পরিচয় দিবে। প্রত্যেকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে এখানে বসবাস করবে। প্রত্যেকে ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পর এখানে ধর্মের ভিত্তিতে জুলুম ও অত্যাচার শুরু হয়। আহমদীদের উপরও অত্যাচার হচ্ছে এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপরও অত্যাচার হচ্ছে। সেই সময়কার যে পরিস্থিতি ছিল সেই অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল। আর সেই সময় যে পরিণতি বের হত, হয়তো তার

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

চেয়েও বেশি ভয়াবহ পরিস্থিতি হত। এই খুনোখুনি ও হানাহানি হয়েছিল তা ছিল মনের ভিতরে ফুটতে থাকা ক্ষোভের আকস্মিক বিস্ফোরণ। যদি বিভাজন না হত, তবে এই খুনোখুনি কোনও না কোনওভাবে হতই।

প্রশ্ন: আমি অনেক তবলীগ করি। যাদেরকে তবলীগ করি, তাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। তারা প্রশ্ন করে যে, যারা সত্য নবী হন তাদের চেহারা আলোকোজ্জল হয়ে থাকে। আপনাদের যে নবী তাঁর চেহারায় যদি নুর থাকত তবে সকলে ঈমান আনত।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর চেহারার থেকে বেশি কারো চেহারায় সেই নুর ছিল না। সেই নুর বেলালের চোখে পড়েছিল, কিন্তু আবু জাহাল তা দেখতে পায় নি। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাত দেখতে পায় নি। তিনি কুরআন করীমের তিলাওয়াত শুনলেন এবং এর শিক্ষা অনুধাবন করলেন তখন সেই শিক্ষা তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করল আর তিনি আলোর সন্ধান করলেন। তাই শিক্ষার মধ্যে তিনি নুর দেখতে পাওয়ার পর আঁ হযরত (সা.)-এর চেহারাতেও তিনি নুর দেখতে পেলেন। তাই তুমি তাদেরকে বল, তুমি যখন স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম' দোয়া চাইবে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা পড়ে দেখবে। দেখ তারা কি বলে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে ভালবাসা এবং খোদার একত্ববাদের শিক্ষা দেন। যখন এই শিক্ষা আপনি অভিনিবেশ সহকারে পড়বেন তখন এই শিক্ষার মধ্যে আপনি নুর দেখতে পাবেন আর তখন সেই শিক্ষা উপস্থাপনকারীর চেহারাতেও নুর দেখতে পাবেন। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগেও তাঁর শত্রুদের মধ্যে সকলেই কেন ইসলাম গ্রহণ করে নি। দারিদ্র পীড়িত মুষ্টিমেয় লোকেরাই ঈমান এনেছিল।

প্রশ্ন: আমি দেড় বছর পূর্বে পাকিস্তান থেকে জার্মানীতে এসেছি। অনেক আহমদী একথা চিন্তা করে এখানে এসেছিল যে খুব শীঘ্রই তাদের কেস পাস হয়ে যাবে এবং তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি জার্মান সরকারের সঙ্গে কোনও চুক্তি করে এসেছিল তবে আশা থাকা চায়। আর যদি এজন্য এসে থাকেন যে সেখানে অনেক কষ্টে আছেন, সেই সব কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে এবং সেখানে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছেন, এবং এর পর দোয়া এবং সদকার উপর জোর দেয় তবে সফল হয়ে যায়। এমন অনেক কেস দেখেছি যারা এসেই কুরআন করীম ও মুসল্লা আঁকড়ে ধরে বসে পড়ে, এবং তারা দোয়া করে, নফল পড়ে এবং সদকা করে। ১৫ দিনেই তাদের কেস পাস হয়ে গেছে। যারা বাহ্যত পুণ্যবান ছিল আর দোয়াও করত, কিন্তু তাদের এখনও পাস হয় নি। তাই অনেকের কাছে আল্লাহ্ তা'লা বেশি করে পরীক্ষাও নেন। কিছু লোকের কেস প্রলম্বিত হয়, আবার কারো তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। দোয়ার প্রতি যদি মনোযোগ থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মানুষের জীবনে কঠিন সময় আসে, সেই সময় সব কিছু সহ্য করতে হয়।

প্রশ্ন: প্রথমে ভাষা শেখা তারপর পড়াশোনা করা- এতে অনেক সময় ব্যায় হয়। এই কারণে জামাতের এমন তো মনে হয় না যে প্রয়োজনের থেকে বেশি সময় আমাদের শিক্ষার জন্য ব্যায় হচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি যদি এফ.এস.সি করার পর এখানে এসেছেন, আপনার কেস পাস হয়ে যায় তবে দেখুন এবং খোঁজ নিন যে বিভিন্ন বিকল্প কি আছে? যা কিছু বিকল্প থাকে তা দেখার পর আমাকে লিখে জেনে নেন। আমি বলে দিব এই বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি আপনার জন্য এবং জামাতের জন্য উপযুক্ত। যাতে আপনার সময়ও অপচয় না হয় আর জামাতের সময়ও অপচয় না হয়।

প্রশ্ন: শরীরচর্চা কতটা করা দরকার?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যতটা সক্রিয় ততটা। আর আপনি তো বেশ চটপটে। মাশাআল্লাহ্॥সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে তো শরীরচর্চা করা উচিত। কাউকে পেটানোর জন্য করা উচিত নয়।

প্রশ্ন: জুমার দিন ইমাম যদি খুতবা দিতে আরম্ভ করে দেয় তবে সুন্নত কখন পড়া উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যখনই জুমার জন্য মসজিদে আসেন সুন্নত পড়ে নেওয়া উচিত। অনেকে উর্দু খুতবা শুনে নেওয়ার পর মাসনুন খুতবার সময় মনোযোগ দেয় না, সেই সময়টুকুতে উঠে দাঁড়িয়ে সুন্নত পড়ে নেয়। এই পদ্ধতি ভুল। প্রথমে সুন্নত পড়ুন তার পর খুতবা শুনুন। মাঝামাঝি যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাতে শুধু মাথা ঠোকাই হয়। তাই এটা সঠিক নয়। কারো যদি বাড়িতে সুন্নত পড়ে আসার সুযোগ থাকে তবে সে বাড়িতে পড়ে আসা উচিত। মসজিদে এসে পড়তে হলে সেখানে পড়ে নিন। কিন্তু যখনই আপনি মসজিদে প্রবেশ করেন তখনই সুন্নত পড়ে নিন। কিন্তু এই যে রীতি তৈরী হয়েছে, আরবী খুতবা শুরু হতেই সুন্নত পড়তে শুরু করে এটা ঠিক না।

প্রশ্ন: আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি যে, ইমাম সাহেব বা-জামাত নামায পড়িয়ে সুন্নত নামাযের জন্য মুসাল্লা থেকে কখনও ডানে কিম্বা বামে সরে দাঁড়ান। ঠিক তেমনি সাধারণ লোকেরাও নিজেদের জায়গা থেকে সামনে কিম্বা পিছনে সরে দাঁড়ান। এর কারণ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: নামাযের স্থান পরিবর্তন করা এক প্রকার সুন্নত। যদি জায়গা থাকে তবে পরিবর্তন দুই পা এদিক ওদিক সরে যাও, যাতে মসজিদের প্রত্যেকটি স্থান থেকে, যদি তার সঙ্গে বরকত সম্পৃক্ত থাকে, তবে সেই বরকত আপনি লাভ করেন। আপনি নিজের বাড়িতেও বিভিন্ন অংশে নামায পড়েন আর নামাযে দোয়া করেন। সেটাও এই কারণে যে, বাড়িতে নামায পড়ার স্থানটি নামায পড়ার কারণে বরকত লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কিন্তু যদি সারিতে জায়গা না থাকে আপনাকে অবশ্যই স্থান পরিবর্তন করতে হবে বলে সামনের জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজে সামনে এগিয়ে এলেন আর কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে দিলেন,এটা সুন্নত- এমনটিও যেন না হয়। কিছু কিছু রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এভাবে জায়গা পাল্টে নেওয়া ভাল। তাই আপনি যদি বলেন, এটা যেহেতু ভাল তাই ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার পেয়ে গেলাম- তবে এটা ঠিক হবে না। জায়গা থাকলে বদলে নিন, অন্যথায় যেখানে জায়গা পান সেখানে নামায পড়ে নিন।

প্রশ্ন: আগামী কয়েক সপ্তাহে আমরা ছুটি পাচ্ছি। ছুটিতে কি আমরা কাজ করার অনুমতি পাব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তোমাদের অর্থের প্রয়োজন থাকে তবে কাজ করুন, অন্যথায় ওয়াকফে আরজি করুন এবং জামাতের কাজ করুন। আর যদি নিজের ফিল্ডে কোনও টেকনিকাল দক্ষতা অর্জন করার জন্য কোনও কাজ করতে হয় তবে ভাল কথা। কাজ করুন, কোনও অসুবিধে নেই। মা-বাবার খরচ কম করার জন্য এবং তাদের সহায়তা করার জন্য যদি কোনও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে চান তবে কিছু সময়ের জন্য কাজ করুন। কিন্তু ছুটি প্রত্যেক ওয়াকফে নওয়ের চেষ্টা করা উচিত কমপক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য ওয়াকফে আরযি করার । আর ওয়াকফে আরযির যে ব্যবস্থাপকরা রয়েছেন তাদেরকে বলুন তারা আপনাদেরকে কোনও জামাতে পাঠিয়ে দিবেন যেখানে আপনারা নামায, কুরআন করীম পাঠ এবং নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদেরও তরবীয়ত করবেন আর যে জামাতে যাবেন সেখানকার কচিকাচাদেরও শিক্ষা দিবেন আর খুদ্দামদেরও শিক্ষা দিবেন এবং পড়াবেন। এছাড়া আপনি যে বাকি সময় পাবেন তাতে নিজের কাজ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পনেরো বছরের উর্দ্ধে ওয়াকফে নও খুদ্দামরা স্কুলের ছুটিতে ওয়াকফে আরযি করে, তবে ওয়াকফে আরযি বিভাগের জন্য এক হাজার ওয়াকফে আরযি এখান থেকেই পেয়ে যাবেন যাদের ওয়াকফে আরযীর লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয় না।

প্রশ্ন: আগামী বছর আমি কলেজে যাচ্ছি। এর জন্য আমাকে ভাল মার্কস পেতে হবে। এর জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের এক শুভাকাঙ্খী ছিলেন। এক বুযুর্গ তাঁর পক্ষ থেকে আল ফযল পত্রিকায় এই মর্মে ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন যে, দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সফলতা দান করেন। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরে জানা যায় তিনি ম্যাট্রিকে সফল হবেন কি করে, তিনি তো তিনটি পরীক্ষাই দেন নি। তাই এভাবে বুজুর্গদের বলে এমনটি প্রকাশ হতে দিবেন না যাতে করে লোকে মনে করে বুজুর্গদের দোয়া, জামাতের দোয়া কবুল হয় না। প্রথমে যদি নিজে কিছুটা সাহস দেখান, পুরো পড়াশোনা করেন, নিজেও দোয়া করেন, নামাযের দিকে মনোযোগ দেন তবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সাহায্য করেন আর তখন অন্যদের দোয়াও কবুল হয়।

প্রশ্ন: পাকিস্তান থেকে এসেছি। দেড় মাস হয়েছে। আমি

এরপর শেষের পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

পালনকারী ছিলেন।তাঁর সম্পর্কে এরূপ কদর্য চিন্তাধারা প্রকাশ করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ। যাই হোক যে ভাবে এরা বলছে যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, আমাদের মুবাল্লিগ সাহেবও রিপোর্ট দিয়েছেন যে তারা ক্ষমাপ্রার্থী।

পতাকাদাহ করা বা ভাংচুর প্রদর্শনের মাধ্যমে আঁ হযরত(সাঃ) সম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।

তথাকথিত মুসলিম সমাজ, আহমদী , অ-আহমদী নির্বিশেষে সকল মুসলমানদেরকে আমি বলছি, সে শিয়া হোক বা সুন্নী হোক বা অন্য কোনো মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুক- আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্তার উপর যখন আক্রমণ হয় তখন সাময়িক উত্তেজনা , পতাকায় অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর প্রদর্শন , দুতাবাসগুলির উপর আক্রমণ ইত্যাদির পরিবর্তে নিজেদের কর্মের সংশোধন করুন যাতে অন্যেরা আঙ্গুল তোলার সুযোগ না পায়।এরা কি মনে করে যে আঁ হযরত (সাঃ) এর সম্মান ও মর্যাদার কেবল মাত্র এতটুকুই মূল্য যে, অগ্নি সংযোগ ঘটানো হলে বা পতাকা দাহ করা হলে কিম্বা কোনো দূতাবাসের মালপত্র পুড়িয়ে দিলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ হয়ে যাবে। না , আমরা সেই নবীর মান্যকারী যিনি অগ্নি নির্বাপন করতে এসেছিলেন , তিনি ভালবাসা দূত হয়ে এসেছিলেন। তিনি শান্তির যুবরাজ ছিলেন। অতএব কোনো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে জগতবাসীকে বোঝাও এবং তাঁর অনুপম শিক্ষা সম্পর্কে বল।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বুদ্ধি ও বিবেক দিক। কিন্তু আমি আহমদীদেরকে বলছি , তাদের জ্ঞান বুদ্ধিতে আসবে কিনা জানিনা, আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক আবাল বৃদ্ধ বনিতা নোংরা কার্টুন প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিজেদেরকে এমন আগুনে নিক্ষেপ করুন যা কখোনো নির্বাপিত হয়না, যা কোনো দেশের পতাকা বা সম্পদকে গ্রাস করেনা,যা কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টায় থেমে যায় না। এখন লোকেরা প্রবল আবেগ ও উত্তেজনা সহকারে উঠে দাঁড়িয়েছে (পাকিস্তানের চিত্র ছিল) আগুন লাগাচ্ছে, যেন অনেক বড় যুদ্ধ করছে। পাঁচ মিনিটে আগুন নিভে যাবে, আমাদের আগুন তো এমন হওয়া উচিত যা সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকবে। সেই আগুন হল আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসার আগুন, যা তাঁর প্রতিটি আদর্শকে গ্রহণ করা এবং তা জগতের সামনে প্রকাশ করার ব্যকুলতার মধ্যে নিহিত। যে আগুন আপনাদের অন্তর ও বুকের মধ্যে যদি একবার লেগে যায় তবে তা চিরকাল লেগেই রইল।এই আগুন এমন যা দোওয়াতেও পরিণত হতে পারে এবং এর শিখাগুলি অহরহ আকাশের দিকে পোঁছাতে থাকে। নিজেদের বেদনা ও ব্যকুলতাকে দোওয়ায় পরিণত করুন এবং আঁ হযরত(সাঃ) এর উপর অজস্র দরুদ প্রেরন করুন।

অতএব এই আগুনকে প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে জ্বলতে থাকতে হবে এবং নিজেদের দোয়ায় পরিণত করতে হবে।কিন্তু তার জন্য আঁ হযরত (সাঃ) ই মাধ্যম হবেন। নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা আকর্ষণ করার জন্য ,পার্থিব মিথ্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য , এই ধরণের যে সব ফিৎনা সৃষ্টি হয় এসব থেকে নিজেদের সুরক্ষিত থাকার জন্য,আঁ হযরত(সাঃ) এর ভালবাসাকে অন্তরে দীপ্তমান রাখার জন্য নিজেদের ইহলোক ও পরলোককে সৌন্দর্য্যময় করে তোলার জন্য আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর অসংখ্য দরুদ প্রেরণ করা উচিত। অত্যাধিক হারে দরুদ প্রেরণ করা উচিত। বর্তমানের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে নিজেদেরকে আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসায় নিমগ্ন রাখতে হলে নিজেদের প্রজন্মকে আহমদীয়াত ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার স্বার্থে প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলীকে দৃঢ়তার সহিত পালন করতে হবে।

"নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিস্তাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে) ।হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরুদ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।"

আঁ হযরত(সাঃ) একবার বলেন,বরং এর কয়েকটি উদ্ধৃতি রয়েছে , যে, আমার উপর তো আল্লাহ ও তাঁর ফিরিস্তাগণের দরুদ পাঠানোই যথেষ্ট , তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে সেটা তোমাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

আঁ হযরত (সাঃ) এর অবমাননাকর গতিবিধির উপর হঠকারিতা ঐশী শাস্তিকে আহ্বান জানানোর নামান্তর।

পশ্চিমি দেশগুলি অতি দ্রুততার সঙ্গে ধর্মকে বর্জন করে স্বাধীনতার নামে প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে বিকৃত করে চলেছে।তারা এটা জানেনা যে কিরূপে নিজেদের ধ্বংসকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে। কিছুদিন আগে ইটালির এক মন্ত্রী নতুন করে আরও একটি ফাসাদমূলক কান্ড ঘটিয়েছেন । এই নোংরা ও অশ্লীল কার্টুন টি-শার্টের উপর ছাপিয়ে পরিধান করা শুরু করেছে।আর অন্যদেরকেও বলেছেন যে আমার কাছ থেকে নাও। শুনলাম সেখানে বিক্রিও করা হচ্ছে। আর বলছেন যে মুসলমানদের এটাই উপাচার। তাই আমরা একথা জানিনা যে এটা মুসলমানদের জন্য উপাচার কি না। নির্বুদ্ধিতার কারণে যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। কিন্তু সেটা নিরন্তর ধৃষ্টতার সাথে করে যাওয়া এবং এই বলে হঠকারীতা প্রদর্শন করা যে, আমরা যা করছি উচিৎ করছি। তাদের এটা মাথায় রাখা উচিৎ যে, এই সকল গতিবিধি খোদাতায়ালার প্রকোপকে অবশ্যই উস্কে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আহমদীদের কি প্রতিক্রিয়া হওয়া বাঞ্ছনীয়?

এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার প্রকোপকে অবশ্যই উস্কে দেয়।যাই হোক যেরূপ আমি বলেছিলাম যে বাকী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার কথা তো তারা নিজেরা জানে, কিন্তু একজন আহমদী মুসলমানের প্রতিক্রিয়া এই হওয়া উচিৎ যে তাদেরকে বোঝান , খোদার প্রকোপ সম্পর্কে ভয় দেখান। যেরূপ আমি পূর্বেও বলেছি যে আঁ হযরত(সাঃ) এর সুন্দর চিত্র দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করুন।এবং আমাদের সামর্থ্যবান ও শক্তিশালী খোদার সমক্ষে অবনত হও এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।যদি এরা প্রকোপের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে তবে সেই খোদা যিনি তাঁর নিজের এবং অনুরাগভাজনদের জন্য আত্মাভিমান রাখেন।তিনি তাঁর রুদ্র রূপ ধারণ করে প্রকট হবারও শক্তি রাখেন। তিনি সমস্ত শক্তির অধিপতি, যিনি মানুষের তৈরী আইন মানতে বাধ্য নন। প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ রাখেন।তাঁর জাঁতাকল যেদিন ঘুরবে সেদিন তা মানুষের কল্পনাকে অতিক্রম করে যাবে , তার থেকে কেউ নিস্তার পাবেনা।

অতএব আহমদীদের পাশ্চাত্যের কিছু মানুষের বা কিছু রাষ্ট্রের আচরণ দেখে খোদা তায়ালার প্রতি আরও বেশি নতজানু হওয়া দরকার। খোদার মসীহ ইউরোপকেও সাবধানবাণী দিয়ে রেখেছেন, আর আমেরিকাকেও সাবধান বাণী দিয়ে রেখেছেন। এই সকল ভুমিকম্প , ঝড়,প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা কিছু পৃথিবীতে প্রকাশ পাচ্ছে তা কেবলমাত্র এশিয়ার জন্য নির্দিষ্ট নয়। আমেরিকা তো এর একটি আভাস পেয়ে গিয়েছে।অতএব হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নও । তাই খোদাকে একটু ভয় কর আর খোদার আত্মাভিমানকে উত্তেজিত কোরোনা। কিন্তু আমি সে সঙ্গেই বলব যে মুসলমান দেশগুলি বা যারা মুসলমান দাবীকারীরা তারা নিজেদের চাল চলন সংশোধন করুন। এমন আচরণ ও এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন যার দ্বারা আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদা, তাঁর সৌন্দর্য্য পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত হয়। এটাই সঠিক প্রতিক্রিয়া যা একজন মোমিনের হওয়া উচিত।

ইসলামের মর্যাদা,বৈভব এবং আঁ হযরত(সাঃ) এর পবিত্রতাকে একমাত্র মসীহ ও মেহেদীর জামাতই প্রতিষ্ঠিত করবে।

এখন বর্তমানে যা কিছু গতিবিধি হচ্ছে সেটা কেমন ইসলামী প্রতিক্রিয়া যে, নিজেদের দেশের মানুষদের হত্যা করে দেওয়া হচ্ছে, আর নিজেদের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম তো অন্য জাতির শত্রুতার ক্ষেত্রেও ন্যায় পরায়ণাতকে বর্জন করার অনুমতি দেয়না। বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করার আদেশ দেয়।কিন্তু কিছু দিন পূর্বে পাকিস্তানে বা অন্যান্য মুসলিম দেশে যা ঘটল তা সম্পূর্ণ এর পরিপন্থী।যাই হোক এই সকল মুসলিম দেশগুলিতে বিদেশিদের ব্যবসা বানিজ্য ও দূতাবাসগুলির ক্ষতি করা হোক কিম্বা নিজেদের লোকদেরই ক্ষতি করার কাজ হোক , এগুলি ইসলামকে কলঙ্কিত করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (ক্রমশ.....)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 16 June, 2022 Issue No. 24

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

জানতে চাই যে, নামাযে যখন সারি ঠিক করতে বলে,তখন গোড়ালিকে পরস্পর জুড়ে দিতে হয় নাকি কাঁধগুলিকে? আর যখন এক রাকাত হওয়ার পর সারি এলোমেলো হয়ে যায় তখন কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের গোড়ালিগুলো যদি পরস্পর জুড়ে থাকে তবে কাঁধগুলি পরস্পর এমনিতেই জুড়ে যাবে। আমি এটা বুঝতে পারছি না যে নামায পড়তে পড়তে সারি কিভাবে নষ্ট নষ্ট হয়? যতক্ষণ সারিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি সেই সময়ে আমার গোড়ালি কখনও সরে গেছে বলে আমার মনে পড়ে না। হয়তো কখনও এমনটি হয়েও যায়। কিন্তু যদি গোড়ালি সরে যায় তাহলে গোড়ালি সোজা করে নিন।এতে একটা উপকার হয়। গোড়ালি সোজা করার কারণে কাঁধও পরস্পর জুড়ে যায়। যদি আপনার গোড়ালি কিছুটা পিছনে চলে যায় তবে পিছনের সারির নামাযি সিজদায় যাওয়ার সময় আপনাকে ধাক্কা মারবে। আপনার কারণে তার সিজদা করতে অসুবিধে হবে,তখন সে আপনাকে ধাক্কা দিবে। আর যদি সে বেশি সচেতন হয় তবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই আপনি যদি গোড়ালি সোজা রাখেন আপনার কাঁধও সোজা থাকবে।

প্রশ্ন: আমি দেড় মাস আগে পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছি। আজ আমি এভাবে হুযুরের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে পারছি যে, পাকিস্তানিরা কোন নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। পাকিস্তানের ভাগ্যে কি এই নেয়ামত জুটবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: দোয়া করুন। সদকা করুন। এই জন্য আমি বলতে থাকি আর প্রায় এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি যে, যারা বাইরে এসেছে তাদেরকেও বলি যে, দোয়া করুন। যারা পাকিস্তানী, তাদেরকেও বলি দোয়া করুন, রোযা রাখুন,সদকা দিন। আল্লাহ্ তা'লা এই কঠিন সময় দূর করে দিন। আমীন।

প্রশ্ন: আমি ডিপ্লোমা করেছি। এখন আমি মেডিক্যাল টেকনিকে যেতে চাই। এর জন্য কি আমি অনুমতি পাব? মেডিক্যাল ফিল্ডে যে সব মেশিন ও যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সবের টেকনিশিয়ান হতে চাই, সেগুলির মেকানিক হতে হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেশিনের যে টেকনিকাল দিক রয়েছে, অর্থাৎ টেকনিক্যাল স্টাফ রয়েছে, সেই কোর্স করতে চান। বেশ করুন।

এক ওয়াকফে নও নিবেদন করে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেছিলেন- হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যে সব পরিধান ও তাবাররুক রয়েছে সেগুলি ইউরোপ বা আমেরিকার মত কোনও সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। সেখানে বেশি সময় পর্যন্ত ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং বাদশাহদের জন্য তাবারক হয়ে থাকার কারণ হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাবাররুক তো এত বেশি লোকের কাছে আছে। তারা তাঁর পরিধানকে ছোট ছোট টুকরো করে পরিবারের মধ্যে বিতরণ করে নিয়েছে। এখন কিভাবে সংরক্ষণ করবে? তবে কিছু কিছু তাবাররুক এখনও আছে যেমন কোট, যেটি আমি আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় পরে থাকি। এছাড়া আমার ফুফির কাছের হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি কোট ছিল, সেটিও তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন সেটি আমার কাছেই আছে। আমার কাছে এখন দুটি কোট আছে। এভাবে দুটি তাবাররুক হয়ে গেল আমার। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য লোকেদের কাছে ছিল সেগুলি তারা বিতরণ করে দিয়েছে। এছাড়া আসল তাবাররুক হল তাঁর শিক্ষামালা, সেগুলির প্রসার করুন।

মসজিদ বায়তুস সুবহান-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

আলহামদোলিল্লাহ্॥ আজ এখানে মোরফিল্ডন জামাতকেও আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন এখানে জামাতের পরিচিতি আগের চায়তে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আজ আমার এজন্য আনন্দ হচ্ছে যে মসজিদ তৈরীর হওয়ার পর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জামাতের পরিচিতরাই নয় অনেক স্থানীয় জার্মানও এখানে এসেছেন। যা থেকে জানা যায় যে এখানে জামাতের সদস্য এবং স্থানীয় লোকেদের মাঝে সম্প্রীতি রয়েছে। আর এই জিনিসটিই যদি দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মাঝে যখন পাওয়া যায় তখন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার পরিবেশ তৈরী হয় আর সমাজে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমীর সাহেব তাঁর ভাষণের বলেছেন, যেটুকু উর্দু অনুবাদ তাঁর ভাষণ থেকে শুনেছি, এখানে কিছু ধর্মীয় কারণের ভিত্তিতে প্রোটেস্ট্যান্টরা এসেছিলেন। আমি বলতে চাই যে, জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা ধর্মীয় কারণে এসেছে। জার্মানীতে পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এসেছে জামাতের সদস্যরা আর জার্মান জাতি যেভাবে তাদেরকে নিজেদের মধ্যে সমন্বিত করছে আর আহমদীরা ছোট ও বড় শহরগুলিতে যেভাবে সমন্বিত হয়েছে আর এই শহরেও জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা এই কারণেই এসেছে যে পাকিস্তানে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই তারা নিজেদের দেশ তথা মাতৃভূমি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু পূর্বে যারা এখানে এসেছিলেন তাদের আসা দীর্ঘকাল হয়েছে। এখন তাদের প্রজন্মরা জার্মান সমাজে লালিত পালিত হচ্ছে, এখানকার স্কুলে শিক্ষার্জন করছে এবং সমাজে থেকে মুসলমান হলেও তারা জার্মান জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচিতি তৈরী করেছে। গাত্রবর্ণ ও শারিরিক গঠন ইত্যাদির পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু অনেক সময় এখানকার আহমদী যুবকদের দেখে আমার মনে হয় এরা জার্মান জাতির অংশে পরিণত হয়েছে। আর বহিরাগতরা যখন কোনও জাতিতে সমন্বিত হতে চায়,সেই জাতির অংশে পরিণত হয়ে চায়, তখন তাদের উচিত সেই জাতির গুণাবলী গ্রহণ করা এবং নিজেদের গুণাবলী তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা এবং দেশের উন্নতিতে যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়া।

অতএব, জামাত আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য হল যেখানেই জামাতের সদস্যরা যায় তারা সব সময় দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে আর দেশের সেবার জ ন্য সর্বান্তকরণে প্রস্তুত থাকে। এবং দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পুরো চেষ্টা করে,যদিও তারা ধমীয় দিক থেকে ভিন্ন। আর এটিও এই জাতির বৈশিষ্ট্য যে, তারা দেশ থেকে বঞ্চিতদেরকে এখানে মসজিদ তৈরীর অনুমতি দিয়েছে, এবং নিজেদের ধর্মীয় অনুশীলন করার অনুমতি দিয়েছে, যাদেরকে নিজেদের দেশে মসজিদে নামায পড়তে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এটি অনেক বড় একটি গুণ। এই জন্য তাদের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আর আহমদীদের মধ্যে যারাই এখানে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে এই দেশের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমীর সাহেব মিনার সম্পর্কে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে কিছু মানুষের মনে এই ধারণার উদ্রেক হয়। তাই আমি বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিতে চাই। আমীর সাহেব বলেছেন, এখানে ১৬ মিটার উঁচু মিনার হবে যা জার্মানীতে আমাদের মসজিদগুলির মধ্যে উচ্চতম হবে। তাই স্থানীয় লোকেদের মাঝেও কোনও সংরক্ষণশীল মনোভাব হয়তো থাকতে পারে যে এখানে কেন এত উঁচু মিনার তৈরী হচ্ছে। এই মিনার তৈরীতে তাদের যে গর্ববোধ হচ্ছে তা আমাদের এই সমাজে কোথাও নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, মিনারা উঁচু হওয়ার কারণে গর্ব হচ্ছে না, বরং (যদি গর্ব হয়ে থাকে) তবে তা এজন্য যে, এই মিনার যত উঁচু হবে তত বেশি এই মসজিদ তথা পরিবেশ থেকে শান্তি, ভালবাসা এবং সম্প্রীতির বার্তার প্রসার ঘটবে। যারা জামাত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন তারা দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণের সঙ্গেই ভালবাসা, সম্প্রতি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী এতদঅঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। আর সমাজে আরও বেশি সমন্বয় ঘটবে। মসজিদ তৈরীর ফলে কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন তৈরী হবে না। বরং মসজিদ তৈরী হওয়ার ফলে, আর যেখানেই আমাদের মসজিদ তৈরী হয়েছে,সমাজে আমরা আরও বেশি করে সমন্বিত হয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ এই মসজিদ তৈরী হওয়ার পরও আমরা আরও বেশি করে এই শহরের নাগরিকদের মধ্যে সমন্বিত হব।

যাইহোক মেয়র সাহেবও নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমীর সাহেবও তাঁর সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir